দেশ কাল মানুষের
# নাগরিক
আজ কাল পরশু

প্রথম বর্ষ • ১২ তম সংখ্যা • ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

## ভিতরের পাতায়


- আর জি কর কাণ্ড প্রতিবাদ,
  বিচারের দাবি চলছে চলবে - ২
- ‘অভয়া’ - তুমি ঘুমোও সাথী, আমরা প্রহর জাগি - ৩
- নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ
  অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার - ৭
- অন্য চোখে কাশ্মীর - ১১
- বন্ধু আদানিকে জনগণের ছেচল্লিশ হাজার কোটি টাকা
  বিলিয়ে দিল মোদী সরকার - ১২
- ব্যক্তিগত কর কর্পোরেট করের থেকে
  আবার বেশি ঃ নিষ্পেষিত গরিব মধ্যবিত্ত - ১৩
- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের চক্রান্ত ঃ
  আত্মবিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী -১৪
- আমরা কি ‘খিলাফা-ই-বাংগাল’-এর জন্য প্রস্তুত ? - ১৭
- সোমনাথ হোরের শিল্প দর্শন ও
  আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা - ১৮
- সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যপাল ও
  স্পিকারের ভূমিকা - ২০
- সাম্প্রদায়িক গোরক্ষক বাহিনীর বর্বরোচিত কাজ - ২২
- পুরস্কার ও সম্মান মূল্য ত্যাগ - ২৩


সম্পাদক
শান্তনু দত্তচৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com
ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

৮ সেপ্টেম্বর অভয়া ধর্ষণ-হত্যার এক মাস, অভয়ার বিচার না পাওয়ার এক মাস। ৯ সেপ্টেম্বর শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রবিবার বিকাল ৩ টায় নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে ধর্মতলা জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর ডাকে মহা মিছিল বেরোয়।

এই মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য সমস্ত স্তরের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, জনসাধারণ, মেডিকেল ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের আহ্বান জানায় জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম। এবং সমস্ত স্কুল, কলেজ, পাড়া যারা বা যে সংগঠনগুলি যে যেভাবে অভয়ার বিচারের দাবীতে গত এক মাস পথে নেমেছিলেন তাদের প্রত্যেককে আহবান জানানো হয়। জেলায় জেলায় গ্রামে গঞ্জে অনুরূপ মিছিলের আহবান জানানো হয়। এখন পর্যন্ত যা খবর , এই আহ্বানে গোটা রাজ্য জুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়।

এই ক্লেদাক্ত ধর্ষক সমাজের জন্যই অভয়ার জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটল। সারা দেশ জুড়ে এরকম তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া আগে কখনো দেখা যায় নি। তাও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও ধর্ষণ ঘটে যাচ্ছে। এই দানবীয় শক্তির সম্পূর্ণ মুলোচ্ছেদ ঘটাতে পারলেই অসংখ্য অভয়ার ঘাতকদের প্রকৃত শাস্তি হবে।

# আর জি কর কাণ্ড প্রতিবাদ, বিচারের দাবি চলছে চলবে

মিলন দত্ত

আরজি কর মেডিকেল কলেজে গত ৯ আগস্ট মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা নজিরহীন। প্রায় কোনও সংগঠিত নেতৃত্ব ছাড়াই স্রেফ সাধারণ মানুষের বিশেষত মহিলাদের উদ্যোগে এবং তাঁদের দৃপ্ত যোগদানে যে বিপুল বিক্ষোভ সমাবেশ বা মিছিল প্রতিদিন প্রতিরাত শহর জনপদ দখল করে নিচ্ছে তা কেউ দেখেনি কোনও দিন। এই ভিড়ে দলীয় রাজনীতির লোকেরা আছেন নিশ্চয় তবে তাঁরা পরিচয়হীন জনতা হয়ে যোগ দিচ্ছেন সমাবেশে মিছিলে। সবার মুখে কার্যত একটাই স্লোগান 'উই ওয়ান্ট জাসটিস', সবার কণ্ঠে একটাই স্বর 'জাসটিস ফর আরজিকর'।

এমন পতাকাহীন দলীয় চিহ্নহীন রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেনি এ দেশ। বিচার যত বিলম্বিত হচ্ছে, নারকীয় ঘটনার পেছনে শাসক দলের যোগ যত স্পষ্ট হচ্ছে আন্দোলন তত জোরদার হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার নানা পেশার মানুষ অভিনব আন্দোলনের নজির সৃষ্টি করছেন। সুন্দরবনের মেয়েরা নৌকায় করে নদীর বুকে দাঁড়িয়ে 'জাসটিস' দাবি করেছেন। এ দিকে আরজি করে মদিলা টিকিৎসকের নারকীয় ধর্ষণ আর হত্যার ঘটনা চাপা দেওয়ার সব রকম চেষ্টার পরে সত্য ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা হন্দোপাধ্যায় তড়িঘড়ি বিধানসভা অধিবেষন ডেকে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিল এনেছেন। তাতে তাঁর সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা ঢাকা তো পড়েইনি, রাজ্যবাসীর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতাও বাড়েনি।

কলকাতা হাইকোর্ট থেকে স্বতপ্রনোদিতভাবে এই মামলা সুপ্রিম কোর্ট নেওয়ার পরে দুটো শুনানি হয়েছে। সেই শুনানিও যেভাবে হয়েছে তা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় নজিরবিহীন। গোটা বিচার প্রক্রিয়া অনলাইনে গোটা বিশ্বে দেখার ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় শুনানির দিন গত ৫ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ওই দিন প্রধান বিচারপতি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। তাতে মামলার শুনানির দিন নতুন করে ধার্য করা হয়। দায়ের করা মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন ৯ সেপ্টেম্বর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এই পত্রিকা যখন পাঠকের হাতে পৌছবে তখন হয়তো শুনানি চলবে বা তার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে আদালতের পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্তের দায়িত্ব পাওয়া সংস্থা সিবিআই। এবার সেই প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আর দেশবাসীও তাকিয়ে আছেন ওই শুনানির দিকে। অপেক্ষায় আছেন, সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দেন। তার অপেক্ষায় ৮ সেপ্টেম্বর সারারাত জাগবে এ রাজ্য।

ইতিমধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকেরা করেছেন লালাবাজার অভিযান। রাস্তায় রোদ বৃষ্টির মধ্যে সারা দিন সারা রাত অপেক্ষা করিয়ে তাঁদের শেষ পর্যন্ত লালবাজারে গিয়ে পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ওই সিপিরই হাতে স্মারকলিপি দেওয়ার দাবি নেনে নিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

চিকিৎসক ধর্ষণ,হত্যার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করা মামলার প্রথম পর্বের শুনানি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে ২২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে এই শুনানি হয়। বেঞ্চের অপর দুই বিচারপতি হলেন বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র। প্রথম দিনের শুনানির সময় বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা মন্তব্য করেন, তাঁর ৩০ বছরের জীবনে পুলিশের এ রকম হত্যা মামলা গ্রহণের নজির তিনি দেখেননি। সুপ্রিম কোর্ট ওই দিনের শুনানিতে নারী চিকিৎসককে হত্যার ঘটনায় এফআইআর নিয়ে টালবাহানা, সুরতহাল ও ময়নাতদন্তের পর ইউডি বা অপমৃত্যুর মামলা করার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেন। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়ে দেন, সিবিআইয়ের তদন্ত চলবে। মামলায় কলকাতার এক পুলিশ কর্মকর্তাকেও সুপ্রিম কোর্ট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্ট ওই দিন প্রশ্ন তোলেন, চিকিৎসকের মরদেহ পাওয়ার ১৪ ঘণ্টা পর ও ময়নাতদন্ত শেষে কেন ইউডি মামলার রেকর্ড হলো? ওই ঘটনায় সর্বোচ্চ আদালত আন্দোলনে যোগ দেওয়া কোনো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ারও নির্দেশ দেন। নির্দেশ দেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা না দেওয়ারও।

আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতারের পরে তাঁর বিপুল সম্পত্রি আর বহু বাড়ির হদিস পেয়েছে সিবিআই। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন চিকিৎসক এবং ছাত্রদের কাছ থেকে যেসব অভিযোগ স্বাস্থ্যভবনে জমা পড়েছিন এবং তার যে তদন্ত রিপোর্ট; সবই সন্দিপের বাড়ি থেকে পেয়েছে সিবিআই। আসলে স্বাস্থ মন্ত্রক তথা স্বাস্থ দফতর সবই ছিল সন্দীপের পকেটে; কারণ তিনি পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ট এবং কাছের মানুষ।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই

তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে নানা মহলে। তদন্তভার হাতে পাওয়ার পর গত ১৫ অগস্ট তাঁকে প্রথম বার তলব করে সিবিআই। সেই দিন হাজিরা দেননি সন্দীপ। পর দিন অবশ্য সল্টলেকের রাস্তা থেকে সিবিআইয়ের গাড়িতে ওঠেন তিনি। সেই গাড়িতে সিবিআইয়ের এক আধিকারিকও ছিলেন। সন্দীপ যান সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দফতরে। তার পর থেকে ২৪ অগস্ট পর্যন্ত টানা ৯ দিন তাঁকে তলব করা হয় সিজিওতে। দৈনিক ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সিবিআই দফতরে থাকতে হয়েছিল সন্দীপকে।

গত ২৫ অগস্ট সকালে সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে হানা দেয় সিবিআইয়ের একটি দল। ৭৫ মিনিট তাদের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করিয়ে রাখার পর দরজা খোলেন সন্দীপ। ভিতরে ঢোকেন সিবিআই কর্তারা। ওই দিন সিবিআই তাঁর বাড়িতেই সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। এ ছাড়া, ওই হাসপাতালে আর্থিক এ মামলার তদন্তভারও সিবিআইয়ের হাতে দিয়েছে আদালত। দু'টি মামলাতেই কেন্দ্রীয় সংস্থার জোড়া আতশকাচের নীচে ছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আর্থিক অনিয়মের মামলায় ২৪ অগস্ট এফআইআরও করেছে সিবিআই। সূত্রের খবর, সেই এফআইআরের ভিত্তিতেই সন্দীপের বাড়িতে পৌঁছেছিল সিবিআইয়ের দল। তার মাঝে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে সন্দীপ-সহ মোট সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষাও করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর থেকে আরজি করে যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে আবাসিক চিকিৎসক থেকে পড়ুয়া, সকলেরই অন্যতম দাবি ছিল সন্দীপের অপসারণ কিংবা পদত্যাগ। আন্দোলনের চাপে পড়ে গত ১২ অগস্ট পদত্যাগ করেন সন্দীপ। স্বাস্থ্য দফতরে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমাও দেন। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সন্দীপকে কলকাতার অন্য একটি সরকারি হাসপাতালে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সেখান থেকেও তাঁর অপসারণের দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। এর মাঝেই কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয় সন্দীপকে ছুটিতে যেতে। সেই থেকে ছুটিতেই ছিলেন সন্দীপ। পরে অবশ্য আন্দোলনের চাপে তাঁকে সেই পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়।

আরজি করে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধারের পর পরই সেই সেমিনার হলের পাশের একটি ঘরের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয় সংস্কারের নামে। অভিযোগ, এ ক্ষেত্রেও সন্দীপের নির্দেশ থাকতে পারে। কেন তড়িঘড়ি সংস্কারের কাজ শুরু করা হল, তা নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ করেন অনেকে। সে বিষয়েও সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। এই আবহেই আরও অভিযোগ ওঠে, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি চলেছে। সে বিষয়ে তদন্তের জন্য গত ১৬ অগস্ট রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়। এক দিন পরেই উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের পরিবর্তে মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে একাধিক বেনিয়মের তত্ত্ব উঠে এসেছে। মর্গ থেকে দেহ উধাও হওয়া থেকে শুরু করে রয়েছে হাসপাতালের জৈব বর্জ্য নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও! এ বিষয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন অতিরিক্ত সুপার আখতার আলি। সেই অভিযোগে সন্দীপ ছাড়াও ছিল আরজি করের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের কর্তা দেবাশিস সোম, হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠ এবং হাসপাতালের চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহকারী বিপ্লব সিংহের নাম।

# 'অভয়া' – তুমি ঘুমোও সাথী, আমরা প্রহর জাগি

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

---

*(২.০৮.২০২৪-এ কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবীতে রাজপথে রাত জেগেছে জুনিয়র ডাক্তারেরা)*

শুরুর কথা ঃ

"নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা ,
মায়ের চোখে বাপের চোখে দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি"

নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে!"

*-('যমুনাবতী', শঙ্খ ঘোষ)*

এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর সন্দীপ ঘোষ সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছে , তবে আরজি কর-এর তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় নয়, আর্থিক দুর্নীতির মামলায়। আন্দোলনকারীদের বয়ানে 'নৈতিক জয়দ

হল। তবে আরও অনেক পথ যাওয়া বাকি। আরও অনেক ক্রিমিনাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গ্রেফতারি না হওয়া অব্দি, আমার ধারণা, এ আন্দোলন চলবে।

এ আন্দোলনের এক অর্থে ইতিহাস-সৃষ্টিকারী এবং সমাজতত্ত্বে ভাবনার উপাদান সরবরাহ করার মতো বিষয় হল , আমরা প্রায় সবস্ময়ই রাষ্ট্রের বা শাসকদলের তৈরি করা অ্যাজেন্ডার প্রতিক্রিয়া জানাই। সে অর্থে আমাদের তথা জনসমাজেরর প্রতিক্রিয়া চরিত্রের বিচারে অনুবর্তী বা reactive। কিন্তু এ আন্দোলন এমন এক পরিস্থিতি ও সন্ধিক্ষণের জন্ম দিয়েছে যা শাসকদলকে (এবং কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রকেও) দিশেহারা করে দিয়েছে। হয়তো বা প্রথমবারের জন্য প্রায় এক মাস ধরে একটি আন্দোলন চলছে যা স্ব-উদ্যোগী অগ্রবর্তী আন্দোলন, যাকে আমরা বলি proactive movement কুর্ণিশ, আন্দোলনকারী সন্তানসম জুনিয়র ডাক্তারদের এবং এদের সহযোগী সমস্ত ডাক্তারসমাজকে!

আজ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। 'অভয়া'র নৃশংসতম ধর্ষণ ও খুনের পরে ২৪ দিন দিন অতিক্রান্ত। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন এবং কর্মবিরতি এখনও চলছে। কারণ? আজ অবধি 'নিরপেক্ষ' তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আমাদের কাছে তদন্তের অগ্রগতির ব্যাপারে সামান্যতম রূপোলী রেখাও রাখতে পারছিল না। গতকাল আংশিক 'ব্রেকথ্রু' হয়েছে। ভরসা রাখি, পরের ধাপগুলোও এগোনো যাবে।

জুনিয়র ডাক্তারদের এবং পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনরত ও সহানুভূতিশীল ডাক্তার সমাজের খুব নির্দিষ্ট ৫ দফা দাবী রয়েছে , (১) যারা 'অভয়া'র ধর্ষণ, খুন এবং প্রমাণ লোপাটের মতো ঘৃণ্যতম কাজের সাথে যুক্ত সেসমস্ত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, (২) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা এই নারকীয় ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের সবাইকে চিহ্নিত করতে হবে, এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে এখুনি স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে বরখাস্ত করতে হবে, (৩) কলকাতার পুলিস কমিশনারকে তার চূড়ান্ত অপদার্থতার জন্য পদত্যাগ করতে হবে, (৪) কোনরকম রাজনৈতিক ভয় ছাড়া (প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিংবা বাইরে থেকে) ছাত্র এবং ডাক্তারদের গণতান্ত্রান্ত্রিক পরিবেশ অধিকার ও পরিবেশ সুরখিত করতে হবে, এবং (৫) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যথোপযুক্ত নিরাপত্তা এবং সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীর সভ্যভাবে কাজ করার জন্য হেলথকেয়ারের সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করতে হবে। সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতারিতে একটি দাবী কেবল পূরণ হল। বাকি দাবীগুলো এখনও অধরা। এরপরেও আমরা চাইব, পৃথিবীতে আলো আসুক, ন্যায়বিচার ফিরে আসুক।

আন্দোলনের নজরকাড়া কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

"চেতাবনি ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষ্যই করিনি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষ্যই করিনি....
লোকে ভুলে যতে চায়, সহজেই ভোলে।"

-('আরুণি উদ্দালক', শঙ্খ ঘোষ)

কিন্তু এ আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভোলেনি। ৯ আগস্ট সকালের আলো ফোটার অপেক্ষায়। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে জীবন একইরকম হয়না। ৩১ বছর বয়সী এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণীরও হয়নি। ও সারাদিনের ডিউটির শেষে রাতের খাবার খেয়ে চেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেমিনার রুমে বিশ্রামের জন্য একাই শুয়েছিল। সম্ভবত ৩ থেকে ৪ জন পশু (৫ জনও হতে পারে, এমনকি যে দলে আরেকজন নারী চিকিৎসকও থাকতে পারে) ওকে গণধর্ষণ করে তারপরে বর্ণনাতীত হিংস্রতায় হত্যা করে। যেরকম নৃশংসভাবে ২য় বর্ষের পোস্টগ্র্যাজুয়েট এই তরুণীকে হাসপাতালের মধ্যে শেষ রাতে গণধর্ষণ করে চরমতম বীভৎসতার সাথে হত্যা করা হয়েছে সে ঘটনা সম্ভবত এক অর্থে তনির্ভয়াদ বা হাথরাসদ-এর ঘটনাকেও ছাপিয়ে গেছে। কলকাতা শহরের বুকে একটি প্রথমসারির হাসপাতালের মধ্যে যে এ ঘটনা যে ঘটতে পারে, সম্ভবত ভারতের ইতিহাসেও বিরল , অন্তত আমার জানা নেই। কারণ? মোটিভ কী? ও কী কলেজের এমন কিছু নারকীয় কার্যকলাপ জেনে ফেলেছিল যে জন্য এই পরিণতি?

প্রথমত, আমার মধ্য-ষাট অতিক্রান্ত জীবনে আজ অব্দি দেখিনি, পার্টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে একেবারে অহিংস এবং সুদৃঢ় এরকম আন্দোলন যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রাস্তায় নামিয়েছে আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়। সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হবার পরিবর্তে আন্দোলন আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে। এখানে কোন পার্টি প্রভাব নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন ঝাণ্ডা নেই, কোন 'আগুন ঝরানো' পার্টিজান শ্লোগান নেই। এ এক ঐতিহাসিক সময় যখন ভারতের সমাজে তৃতীয় পরিসর তথা নাগরিক পরিসরের নতুন ইতিহাস তৈরি হল। কুর্ণিশ আন্দোলন কারীদের!

দ্বিতীয়ত, নারীরা এক নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক শক্তি হিসেবে এ আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। হাজারে হাজারে নারী প্রশ্ন তুলেছে , কেন নারী হবার জন্য আমাকে অতিরিক্ত সুরক্ষা দিতে হবে? কিসের সুরক্ষা? আমার দেহের এবং জীবনের সুরক্ষা?

কেন এই 'পবিত্র' পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ আমার সুরক্ষা সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হবে বারংবার?

উত্তর দিতে হবে, কেন আমাদের বেলাতেই কেবল সুরক্ষার প্রসঙ্গ আসবে?

কেন আমাদের সামাজিক মানসিকতা আমাকে নিজের চারিত্র্যলক্ষ্মণ নিয়ে বাঁচা একজন আনুষদ হিসেবে গ্রহণ করবেনা? কেন?

আর কত ধর্ষণ, হত্যা, রক্তাক্ত শরীর আর ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে চায় তসমাজদ? ঠিক কতটা দেখলে তৃপ্তি হবে সমাজের চোখের, মনের, ধর্ষকামিতার?

আপনারা 'ফাঁসী' কিংবা 'এনকাউন্টার' কিংবা 'রাজনৈতিক যোগ' নিয়ে কথা বলুন, বলতে থাকুন। কিন্তু এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন না? এই 'ইতরের দেশ' কী সভ্য হবে? উত্তর কী কেবল বাতাসেই ভেসে বেড়াবে?

আমরা যে বুকভরে বাতাসও নিতে পারিনা মরে যাবার সময়ে। আমাদের কথা ৩৬৫ দিনে একবার ভাবুন , কারো ফুটফুটে মেয়ে, সক্ষম যুবতী কিংবা গৃহবধু, কামদুনির পড়ুয়া মেয়েটি কিংবা পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের যুবতী। নির্ভয়া, কাশ্মীমেরর বাচ্চা মেয়ে আসিফা, হাথরাস, তারও আগে ২০০৪ সালে মণিপুরের মনোরমা , ধর্ষণ এবং নৃশংসভাবে খুন হবার মিছিল চলছে। এখন অব্দি সর্বশেষ সংযোজন আর জি করের ডাক্তার মেয়েটি।

অন্য কারো পরিচয়ে আমাদের চিনবেন না। আমাদের পরিচয়ে আমাদের চিনতে হবে। চিনতেই হবে। আমাদের বিবশ হয়ে যাওয়া সামাজিক বোধকে এভাবে আর কোন স্মরণীয়কালে আর কোন আন্দোলন বিদ্ধ করেনি। এও এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

তৃতীয়তঃ

''অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাব
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক
প্রত্যেক শরীরের ভগাংশ।''

*-('নির্বাচনিক', সুভাষ মুখোপাধ্যায়)*

আরজি করের ঘটনা এখানে শেষ হয়ে যায়নি। এর প্রতিবাদে 'ইতরের দেশে' বাস করা RG Kar -এর জুনিয়র ডাক্তারেরা পবিত্র ক্রোধ থেকে তীব্র আন্দোলন শুরু করে পরদিন সকাল থেকেই। এতে যুক্ত হয়েছে ডাক্তারদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম, ডাক্তারদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম, কলকাতা শহরের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার মেডিক্যাল কলেজ, ভারতের নামী ডাক্তারি প্রতিষ্ঠানগুলো, দিল্লীর এইমস, চণ্ডীগরের পিজিআই, বিএইচইউ, তামিলনাড়ুর একাধিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দিল্লী, পাটনা সহ ভারতের প্রায় সব প্রান্তের ডাক্তারদের সংগঠন। এমনকি সর্বভারতীয় সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনও অংশগ্রহণ করেছে।

এ দেশ ছাড়িয়ে এ প্রতিবাদের ঢেউ পৌঁছচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে , অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশেও। এমনকি গার্ডিয়ান বা বিবিসি-র মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও এসমস্ত খবর প্রকাশ করেছে। ফলে আমি নতুন কথা এখনো অব্দি কিছু বলিনি , শুধু ইতিহাসকে আরেকবার স্মরণ করানো ছাড়া। তবে গতকালের (১৫.০৮.২০২৪) নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর মতো প্রভাবশালী সংবাদপত্রের খবরটি নজরে আসার মতো , "Medicys Killing Fuels Protests and Walkouts in India"। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , "Outrage among doctors has also continued to build– with many government hospitals suspending all but emergency treatment as medical workers protest to demand better protection from such violence." হ্যাঁ, এটাই ঘটছে।

ল্যান্সেট-এর মতো মান্য মেডিক্যাল জার্নাল-এ ২৪ আগস্ট, ২০২৪-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে "Rape and murder of doctor sparks outrage in India" শিরোনামে। সমধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ। এরকম আন্তর্জাতিক চাপের একটা দেশীয় প্রভাব তো থাকবেই। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং সিবিআই তদন্ত। কোথায় যাবে 'অভয়া'-র সাথীরা? কার কাছে বিচার চাইবে? কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ , কার কাছে সমাধান খুঁজবে? এরকম সময়ে জলকে ঘোলা করে রাজনৈতিক মুনাফার মাছ ধরার খেলা শুরু হয়েছে।

পঞ্চমতঃ

আমাদের কাছে একটি উদ্বেগের বিষয় হল, গণধর্ষণ এবং বীভৎসতম খুনের মামলা সরে যাচ্ছে সন্দীপ ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানির আর্থিক দুর্নীতির নিকৃষ্ট স্বরূপ উদ্ঘাটনের দিকে। মামলা এবং আমাদের দাবীর মূল ভরকেন্দ্র সরে যাচ্ছে। আমাদের দাবী তো খুব সরল , আমরা বিচার চাই (We Want Justice) এবং চাই নারীদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত হোক।

আর্থিক দুর্নীতি এবং পাপের পাহাড় নিয়ে তদন্ত চলুক। কিন্তু প্রথমে সমাধান হোক , ধর্ষণকারীরা কে কে, খুনি কে বা কারা?

আমাদের বেদনাঃ

যেসব রোগীরা ফিরে যাচ্ছে বলে খবরের কাগজে ছবি এবং খবর বেরোচ্ছে, সেসব রোগিদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু আমাদের তরফে জানানোর, জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবরিতিতে থাকলেও, আন্দোলন চালিয়ে গেলেও ইমার্জেন্সি এবং আউটডোর চালু আছে। ভর্তি হওয়া রোগিদের দেখছেন সিনিয়র ডাক্তাররা। জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে যোগ না দিলেও বাইরে সমান্তরাল আউটডোর চলছে। ফলে সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপরে নির্ভর না করে আপনারা নিজেরা অভিজ্ঞতা নিন।

নতুন করে শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তারদের 'অভয়া' ক্লিনিক, রোগীদের চিকিৎসা দেবার জন্য। শুরু হয়েছে টেলিমেডিসিন পরিষেবা।

আপনাদের আমরা কষ্ট বা যন্ত্রণা দিতে চাইনা। কিন্তু আপনাদের বাড়ির মেয়েটির দিকে তাকান। আমাদের অসহায় অবস্থা এবং আমাদের ওপরে লাগাতার নির্যাতনের কথা ভাবুন।

আমরা আবার ফিরে আসছি , খুব শীগগিরই। আমাদের শেষ কথা , নতুন করে আবার ভাবুন রাজনৈতিক দল এবং ঝান্ডা ছাড়া মানুষের বিশুদ্ধ আবেগ এবং পবিত্র ক্রোধকে রাষ্ট্র সবসময় ভয় পায়। চায়, একে বারংবার সহিংস হবার পথে ঠেলে দিতে। সফল না হলে একে প্রশমিত করার জন্য গণতন্ত্রের তথাকথিত চারটি স্তম্ভই কাজ করে , বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন মাত্রায়। সে কাজ করা শুরু হয়েছে, এবং করবেও। আমাদের রাস্তা ধর্ণায় বসে থাকা, পথে নেমে বন্ধু এবং সাথীকে চিনে নেওয়া। নাগরিক সমাজের বিপুল অংশগ্রহণ আমাদের নতুন 'Human Bondage' তৈরি করেছে। অজানা অচেনা প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ এ আন্দোলনের সাথে জুড়ে যাচ্ছে। আড়ে-বহরে 'অভয়া'-র জন্য বিচার চাওয়ার অবয়ব ক্রমাগত বড়ো হচ্ছে।, দীর্ঘ হচ্ছে। আমাদের কাছে অজানা শিশু-কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতী-মাস্টার মশাই-দিদিমণি-দাদা-বৌদি-ভাইদের আমরা জড়িয়ে ধরছি , যেন আরও বেঁধে বেঁধে থাকতে পারি আমরা।

বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত Imagine -এর গায়ক এবং লেখক জন লেনন ১৯৬০-এর দশকের উত্তাল সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন , "When it gets down to having to use violence– then you are playing the systems game. The establishment will irritate you–pull your beard– flick your face – to make you fight. Because once they've got you violent– then they know how to handle you. The only thing they don't know how to handle is non-violence and humour."

হ্যাঁ, রাষ্ট্র হিংস্রতাবর্জিত মাটি কামড়ে পড়ে থাকা আন্দোলনের যথেষ্ট মোকাবিলা করার পদ্ধতি এখনও ভালোভাবে শেখেনি , পুলিস, গুণ্ডা, বুলেট এবং লাঠির ব্যবহার ছাড়া। এরা কৌতুকও গ্রহণ করতে পারেনা। এখানে আমরা চার্লি চ্যাপলিনকে স্মরণ করে কৌতুকে পর্যুদস্ত করার কাজ শুরু করতে পারি। দাবী না মেটা পর্যন্ত আমাদের ফিরে আসার জন্য পাড়ে কোন নৌকো বাঁধা নেই , No Boat to Return।

আপনারা সবাই আসুন, পাশে থাকুন, বেঁধে বেঁধে থাকুন, আমাদের ফিরে আসতে সাহায্য করার জন্য। আরেকটি কথাও পাঠকেরা ভেবে দেখবেন। শহরের এই বড়ো হাসপাতালগুলোর ওপরে এত চাপ কেন? কোথায় গেল আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং জনসাস্থ্যের প্রানবন্ত উপস্থিতি?

জনস্বাস্থ্যের দর্শন একটি ভিন্ন অবস্থান। এটা কোন মেডিক্যাল শিক্ষার বুদবুদের বাজার নয় বা এখানে কোন লুকনো শিক্ষাক্রম নেই। এখানে সবকিছুই অবারিত খোলা এবং পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ। নিজের নিজের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবন-চর্যা এবং সর্বোপরি পড়শি-চেতনা ধরে আছে ভারতের মতো আরো বহু দেশের অসমসত্ত্ব বিপুল জনসমস্টিকে। এই বিশেষ অবস্থান বুঝতে না পারলে মেডিক্যাল কলেজের প্রশিক্ষণ শেষ করা মাত্র জনস্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী চিকিৎসক হয়ে ওঠা যায় না। মুক্ত বাজারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, বিশেষ করে এর উপজাত social psyche, এ দুয়ের প্রভেদ মুছে দিতে বদ্ধ পরিকর।

দানবীয় বহুজাতিক কোম্পানী এবং হিংস্রতম, আগ্রাসী কর্পোরেট পুঁজির কাছে মানুষ শব্দটির ততক্ষণই মূল্য আছে যতক্ষণ সে মুনাফা দিতে পারে। এজন্য ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা, দেহ ও মন থেকে অসুস্থতাকে বিযুক্ত করে দেখে কেবলমাত্র অসুখের জন্য সমস্ত ওষুধ ও প্রযুক্তি তৈরি হয়ে চলছে সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য, মেডিক্যাল শিক্ষাক্রমও বিপুল্ভাবে প্রভাবিত হয়।

ফলে এ আন্দোলন হয়তো প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে।

*-লেখক বিশিষ্ট চিকিৎসক। 'ডক্টর'স ডায়ালগ' এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।*

# নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

আহমাদ ইশতিয়াক

-----------------------------------

*(পূর্বপ্রকাশিতের পর)*

২

মনোরঞ্জন রায়ের সাথে প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্তের পরিচয়ের পর তিনি বুঝতে পারেন যে এই মেয়ে দুটিই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবী কাজ করতে সক্ষম হবে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশের নজরদারী এড়িয়ে মনোরঞ্জন রায় কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম এসে সূর্য সেনের হাতে গান-কটন এবং বোমা তুলে দেন।

এ সময় তিনি জেলে থাকা বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করে চিঠির আদান প্রদান এবং কলকাতা থেকে বিস্ফোরক বহন করে আনার বিপদ সম্পর্কে মাস্টার দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শহর আর গ্রামের যুবকরা পুলিশের চোখে সবচেয়ে বড় সন্দেহভাজন। এ অবস্থায় সূর্য সেন নারী বিপ্লবীদের এসব কাজের দায়িত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ তখনো গোয়েন্দা বিভাগ মেয়েদের সন্দেহ করতো না। মাস্টার দার অনুমতি পাওয়ার পর নারীদের বিপ্লবের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করা হয়। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের কাছে বোমা পৌঁছে দিয়ে কলকাতা ফেরত আসার একদিন পরেই ২৪ নভেম্বর মনোরঞ্জন রায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সে সময়ে টি জে ক্রেগ বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদে নতুন দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম সফরে আসেন। তাকে হত্যা করার জন্য মাস্টার'দা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে মনোনীত করলেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩০ সালের ২ ডিসেম্বর চাঁদপুর রেলস্টেশনে তারা রিভলভার নিয়ে আক্রমণ চালায় কিন্তু ভুল করে তারা মি. ক্রেগের পরিবর্তে চাঁদপুরের এসডিও তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন। সেদিনেই পুলিশ বোমা আর রিভলভারসহ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। এই বোমাগুলোই কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। তারিণী মুখার্জি হত্যা মামলার রায়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।

ব্যয়বহুল বলে আলিপুর জেলের ফাঁসির সেলে মৃত্যু গ্রহণের প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণের সাথে চট্টগ্রাম থেকে আত্মীয়দের মধ্যে কেউ দেখা করতে আসা সম্ভব ছিল না। এ খবর জানার পর মনোরঞ্জন রায় প্রীতিলতার কাছে লেখা এক চিঠিতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে দেখা করার চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছিলেন। মনোরঞ্জন রায়ের মা হিজলী জেলে ছেলের সাথে দেখা করতে গেলে গোপনে তিনি প্রীতিলতাকে লেখা চিঠিটা তার হাতে দেন।

বিপ্লবী মনোরঞ্জন রায়ের পিসি (যিনি গুনু পিসি নামে পরিচিত) তার উপদেশ অনুযায়ী প্রীতিলতা মৃত্যু প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে দেখা করার জন্য আলিপুর জেল কর্তৃপক্ষের কাছে তঅমিতা দাসদ ছদ্মনামে 'কাজিন' পরিচয় দিয়ে দরখাস্ত করেন। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে প্রায় চল্লিশ বার বিপ্লবী রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করেছিলেন তিনি।

১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়। এই ঘটনা প্রীতিলতার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তার ভাষায় 'রামকৃষ্ণদার ফাঁসীর পর বিপ্লবী কর্মকান্ডে সরাসরি যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আমার অনেক বেড়ে গেল।'

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির পর আরো প্রায় নয় মাসের মতো প্রীতিলতাকে কলকাতায় থেকে যেতে হয় বি এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য। পরীক্ষা দিয়ে প্রীতিলতা কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে বাড়ি এসে দেখেন তার বাবার চাকরি নেই। সংসারের অর্থকষ্ট মেটানোর জন্য তাই বাধ্য হয়ে শিক্ষকতার পেশা বেছে নিতে হয় প্রীতিলতাকে।

চট্টগ্রামে বিশিষ্ট দানশীল ব্যক্তিত্ব অপর্ণাচরণ দে'র সহযোগিতায় তখন নন্দনকাননে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নন্দনকানন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (যা এখন অপর্ণাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত)। প্রীতিলতা এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দিলেন। স্কুলে যাওয়া, স্কুলের বাইরে মাসিক মাইনের বিনময়ে পড়ানো, মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করে তার দিনগুলো কাটছিল। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন '১৯৩২ সালে বি এ পরীক্ষার পর মাষ্টারদার সাথে দেখা করবই এই প্রত্যয় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম'।

বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহের কথা প্রীতিলতা কল্পনা দত্তকে বললেন। প্রীতিলতা কলকাতা থেকে আসার এক বছর আগে থেকেই কল্পনা দত্ত বেথুন কলেজ থেকে বদলি হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। সে সুবাদে প্রীতিলতার আগেই কল্পনা দত্তের সাথে মাস্টার দা সূর্য সেনের দেখা হয়েছিল। প্রীতিলতার প্রবল আগ্রহের কারণেই কল্পনা দত্ত একদিন রাতে গ্রামের এক ছোট্ট ঘরে তার সাথে নির্মল সেনের পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৩২ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে ওই সাক্ষাতে নির্মল সেন প্রীতিলতাকে পরিবারের প্রতি কেমন টান আছে তা জানতে চাইলেন। জবাবে তিনি বলেন তটান আছে। কিন্তু পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ তো দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের কাছে বলি

দিতে পারবো।'

এদিকে যুব বিদ্রোহের পর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া সংগঠনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে মাস্টারদা সূর্য সেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কারণে প্রীতিলতার সাথে সে রাতে তার দেখা হয়নি। প্রীতিলতার সাথে এই সাক্ষাতের কথা বলতে গিয়ে মাস্টার দা সূর্যসেন লিখেছিলেন, 'অল্প কয়েকদিন পরেই নির্মলবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হতেই নির্মলবাবু আমায় বলল আমি রাণীকে কথা দিয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করাবো, সে এক সপ্তাহের জন্য যে কোন জায়গায় আসতে রাজী আছে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সে ফাঁসীর আগে দেখা করেছে শুনেই তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হয়েছিলো। তার দেখা করার ব্যাকুলতা শুনে রাজী হলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাকে আনার ব্যবস্থা করলাম'।

মাস্টার দা এবং প্রীতিলতার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাতে মাস্টার দা সূর্যসেন লিখেছিলেন, 'তার চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস দেখলাম। এতদূর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন্য তার চেহারায় ক্লান্তির কোন চিহ্নই লক্ষ্য করলাম না। যে আনন্দের আভা তার চোখে মুখে দেখলাম, তার মধ্যে আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Sincerity শ্রদ্ধার ভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। একজন উচ্চশিক্ষিত cultured lady একটি পর্ণকুটিরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে প্রণাম করে উঠে বিনীতভাবে আমার দিকে দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্ব্বাদ করলামখ'।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে তার দেখা হওয়ার ইতিবৃত্ত, রামকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রীতিলতা প্রায় দুই ঘণ্টার মতো মাস্টার দার সাথে কথা বলেছিলেন। মাস্টার দা আরো লিখেছেন 'ওর action করার আগ্রহ সে পরিষ্কার ভাবেই জানাল। বসে বসে যে মেয়েদের organise করা, organisation চালান প্রভৃতি কাজের দিকে তার প্রবৃত্তি নেই, ইচ্ছাও নেই বলে।'

তিন দিন ধরে ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে থাকার পর অস্ত্রের নিশানা ও চালনা সম্পর্কে প্রীতিলতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের দুই বছর অতিক্রম হয়ে গেল। ইতোমধ্যে বিপ্লবীদের অনেকেই নিহত এবং অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই বছরগুলোতে আক্রমণের নানা পরিকল্পনার পরেও শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীরা নতুন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এসব পরিকল্পনার মূলে ছিলেন মাস্টার দা এবং নির্মল সেন। এই দুজন আত্মগোপণকারী বিপ্লবী তখনো গ্রাম থেকে গ্রামে বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে ঘুরে ঘুরে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন।এই আশ্রয়স্থলগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর টিনের ছাউনি দেয়া মাটির দোতলা বাড়িটি। পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামটা ছিল বিপ্লবীদের অতি শক্তিশালী গোপন আস্তানা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ যুদ্ধের পর থেকে এই গ্রামে ছিলো মিলিটারি ক্যাম্প। এই ক্যাম্প থেকে সেনারা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের ধরার চেষ্টা করতো।

সাবিত্রী দেবীর বাড়ি ছিল ওই ক্যাম্প থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। বিপ্লবীদের কাছে ওই বাড়ির গোপন নাম ছিল 'আশ্রম'। বিধবা সাবিত্রী দেবী এক ছেলে এবং বিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন। বিপ্লবীদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'সাবিত্রী মাসিমা' নামে। এই আশ্রমে বসে সূর্য সেন এবং নির্মল সেন অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং আলোচনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেন। অনেক সময় এই বাড়িতেই তারা দেশ বিদেশের বিপ্লবীদের লেখা বই পড়ে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে সময় কাটাতেন।

১৯৩২ সালের ১২ জুন তুমুল ঝড়-বৃষ্টির দিনে মাস্টার দার পাঠানো এক লোক প্রীতিলতাকে আশ্রমে নিয়ে আসেন। বাড়িতে প্রীতিলতা তার মাকে বলেন তিনি সীতাকুণ্ডে যাচ্ছেন। মাস্টার দা এবং নির্মল সেন ছাড়া ওই বাড়িতে তখন ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামি তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেন (বিপ্লবী ভোলা) অবস্থান করছিলেন। ১৩ জুন সন্ধ্যায় সূর্য সেন এবং তার সহযোগীদের সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে অবস্থানের কথা পটিয়া পুলিশ ক্যাম্প জানতে পারে। এর আগে মে মাসেই ইংরেজ প্রশাসন মাস্টার দা এবং নির্মল সেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

ক্যাম্পের অফিসার-ইন-চার্জ ক্যাপ্টেন ক্যামেরন খবরটা জানার পর ওই বাড়িতে অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পুরস্কার এবং পদোন্নতির আশা নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন দুজন সাব-ইন্সপেক্টর, সাত জন সিপাহী, একজন হাবিলদার এবং দুজন কনস্টেবল নিয়ে রাত প্রায় ৯টার দিকে ধলঘাটের ওই বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এর একটু আগেই মাস্টার দা এবং প্রীতিলতা দোতলা বাড়িটার নিচ তলার রান্নাঘরে ভাত খেতে বসেছিলেন। জ্বরের কারণে নির্মল সেন এবং ভোলা রাতের খাবার খাওয়া বাদ দিয়ে ওপরের তলায় শুয়ে ছিলেন। মাস্টার দার সাথে খেতে বসে অস্বস্তি বোধ করায় প্রীতিলতা দৌড়ে ওপরে চলে যান। এমন সময় মাস্টার দা ঘরের ভেতরের মই বেয়ে দোতলায় উঠে বলেন 'নির্মলবাবু, পুলিশ এসেছে'। মাস্টার দা প্রীতিলতাকে নিচে নেমে এসে মেয়েদের সাথে থাকার নির্দেশ দেন। ততক্ষণে

সিপাহী এবং কনস্টেবলরা ঘর ঘিরে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন এবং সাব-ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জন বোস ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘরের একতলায় থাকা সাবিত্রী দেবী ও তার ছেলে মেয়েকে দেখতে পান। 'ঘরে আর কে আছে?' এ প্রশ্ন করে কোনো উত্তর না পাওয়া অভিযান পরিচালনাকারীরা এসময় ঘরের উপরের তলায় পায়ের আওয়াজের শব্দ শুনতে পান।

ক্যাপ্টেন ক্যামেরন হাতে রিভলভার নিয়ে ঘরের বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সিদ্ধান্ত নেন। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতেই নির্মল সেনের করা দুইটা গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন মারা যান। গুলির শব্দ পাওয়ার পরেই ঘরের চারিদিকে থাকা সৈন্যরা চারিদিক থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করে। একটা গুলি এসে নির্মল সেনের বুকে লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। টাকা পয়সা এবং কাগজপত্র গুছিয়ে প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেনকে সঙ্গে নিয়ে মাস্টারদা অন্ধকারে ঘরের বাইরে আসেন। এই সময়ে আমের শুকনো পাতায় পা পড়ার শব্দ পেয়ে আশেপাশে থাকা সিপাহীদের চালানো গুলিতে সবার আগে থাকা অপূর্ব সেন মারা যান।

মাস্টারদা আর প্রীতিলতা সেই রাতে কচুরিপানা ভরা পুকুরে সাঁতার কেটে আর কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে পটিয়ার কাশীয়াইশ গ্রামে দলের কর্মী সারোয়াতলী স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র মনিলাল দত্তের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছান। মণিলাল ওই বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। মাস্টারদার জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ লিখে ধলঘাটে এনেছিলেন প্রীতিলতা। সে পান্ডুলিপি পুকুরের মধ্যে হারিয়ে গেল। তাদেরকে নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে নিয়ে যেতে বলেন মাস্টারদা।

মণিলাল দত্ত তাদেরকে ধলঘাট থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে পাহাড়, জঙ্গল এবং নদীর কাছাকাছি একটা গ্রাম জৈষ্ঠ্যপুরায় নিয়ে যেতে মনস্থির করলেন। পুলিশ এলে পাহাড় এবং জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা যাবে অথবা নদী পার হয়ে অন্য আশ্রয়ে যাওয়া যাবে। মাস্টারদা সূর্য সেন পরের দিন প্রীতিলতাকে বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেন। এর আগে সূর্য সেনের নির্দেশে মণিলাল প্রীতিলতার বাসায় পুলিশের নজরদারি আছে কিনা তা জানতে শহরে খোঁজ নিয়েছিলেন। তসব কিছু ঠিক আছেদ জানার পর প্রীতিলতাকে বাড়ি গিয়ে স্কুল শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।

ধলঘাট সংঘর্ষের সে রাতেই গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের মৃত্যুর পর পুলিশের এসআই মনোরঞ্জন বোস পটিয়ার মিলিটারি ক্যাম্পে গিয়ে আরো ত্রিশ জন সৈন্য এবং একটা লুইস গান নিয়ে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে ফিরে আসে। লুইস গানের গুলিবর্ষণে বাড়িটা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।

সকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও সেনাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। সাবিত্রী দেবী এবং তার ছেলে মেয়েকে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মেয়ে স্নেহলতার জবানবন্দিতে আরো তিন যুবক; দীনেশ দাশগুপ্ত, অজিত বিশ্বাস এবং মনীন্দ্র দাশকে আটক করা হয়। পরবর্তীকালে সাবিত্রী দেবী, তার পুত্র রামকৃষ্ণ এবং এই তিন যুবককে বিপ্লবীদের আশ্রয় এবং সহায়তা করার দায়ে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ঘরের ভেতর চালানো তল্লাশিতে রিভলভার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের দুইটা ছবি, পাশাপাশি দুইটা মেয়ের ছবি (যার মধ্যে একজন ছিল প্রীতিলতা) সহ কিছু চিঠি এবং দুইটা বইয়ের পান্ডুলিপি পাওয়া যায়।

ধলঘাটে ছবি পাওয়ার পর ১৯ জুন পুলিশ বাসায় গিয়ে প্রীতিলতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২২ জুন এসআই শৈলেন্দ্র সেনগুপ্ত এর নেতৃত্বে একটি দল ওই বাড়িতে আরেক দফা তল্লাশি চালায়। তার নির্দেশে আশেপাশের সব জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়। জঙ্গল এবং আশেপাশের পুকুরে তল্লাশিতে অনেক কাগজপত্র উদ্ধার করা হয় যা থেকে প্রমাণিত হয় চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পর আত্মগোপনে থেকেও বিপ্লবীরা তাদের আদর্শের সাথে বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়া এবং সামরিক প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

তল্লাশি অভিযানে কাজিন পরিচয় দিয়ে অমিতা দাশের (প্রীতিলতার) আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসির প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাতের হাতে লেখা একটি বিবরণী পাওয়া যায়। ওই হাতের লেখার সাথে মেলানোর জন্য ৩০ জুন প্রীতিলতার বাসা থেকে পুলিশ তার গানের একটা বই নিয়ে যায়। মাস্টারদা প্রীতিলতাকে আত্মগোপনের নির্দেশ দেন। ৫ জুলাই মনিলাল দত্ত এবং বীরেশ্বর রায়ের সাথে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে প্রীতিলতা আত্মগোপন করে। ছাত্রী পড়ানোর কথা বলে তিনি বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন।

তার বাবা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার তখন অনেক খোঁজ খবর করেও মেয়ের কোনো সন্ধান পাননি। ব্যর্থ হয়ে যখন থানায় খবরটা জানানো হলো, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর যোগেন গুপ্ত আরেক নারী বিপ্লবী কল্পনা দত্তের বাড়িতে যান। কল্পনা দত্ত ওই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'আমাদের বাসায় এসে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর বলে এত শান্তশিষ্ট নম্র মেয়ে ও, এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ভাবতেও পারি না তার ভিতর এত কিছু আছে! আমাদের খুব ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে গেল।' চট্টগ্রাম শহরের গোপন আস্তানায় কিছু দিন কাটিয়ে প্রীতিলতা

পড়ৈকড়া গ্রামের রমণী চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। বিপ্লবীদের আরেক গোপন আস্তানা এই বাড়িটার সাংকেতিক নাম ছিল 'কুন্তলা'। এই বাড়িতে তখন আত্মগোপনে ছিলেন মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদার। প্রীতিলতার আত্মগোপনের খবর ১৩ জুলাই ১৯৩২ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'চট্টগ্রামের পলাতকা' শিরোনামের এই সংবাদে লেখা হয় 'চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।'

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম পরিকল্পনা ছিল পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। কিন্তু গুড ফ্রাইডের কারণে সেদিনের ওই পরিকল্পনা সফল করা যায়নি। চট্টগ্রাম শহরের উত্তরদিকে পাহাড়তলী স্টেশনের কাছে এই ক্লাব ছিল ব্রিটিশদের প্রমোদকেন্দ্র। পাহাড় ঘেরা এই ক্লাবের চতুর্দিকে প্রহরীদের অবস্থান ছিল। একমাত্র শ্বেতাঙ্গরা ছাড়া এবং ক্লাবের কর্মচারী, বয়-বেয়ারা, দারোয়ান ছাড়া এদেশীয় কেউ ওই ক্লাবের ধারে কাছে যেতে পারতো না। ক্লাবের সামনের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল ডগ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান প্রহিবিটেডদ। সন্ধ্যা থেকেই ইংরেজরা এই ক্লাবে এসে মদ খেয়ে নাচ, গান এবং আনন্দ উল্লাস করতো। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের জন্য নতুনভাবে পরিকল্পনা শুরু করে। চট্টগ্রাম শহরের কাছে দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে ওই ক্লাবেরই একজন বেয়ারা যোগেশ মজুমদারের বাড়িতে বিপ্লবীরা আশ্রয় পেলেন।

১৯৩২ সালের ১০ আগস্ট ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের দিন ধার্য করা হয়। শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাত জনের একটা দল সেদিন ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর প্রতিজ্ঞা ছিল ক্লাব আক্রমণের কাজ শেষ হবার পর নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরার যদি সুযোগ থাকে তবুও তিনি আত্মবিসর্জন দেবেন। তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। গভীর রাতে কাট্টলীর সমুদ্রসৈকতে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল।

মাস্টারদা ১৯৩২ এর সেপ্টেম্বর মাসে আবার ইউরোপিয়ান ক্লাবে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আক্রমণের দায়িত্ব তিনি নারী বিপ্লবীদের ওপর দেবেন বলেন মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু সাত দিন আগেই পুলিশের হাতে পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত ধরা পরে গেলে আক্রমণে নেতৃত্বের ভার পড়ে একমাত্র নারী বিপ্লবী প্রীতিলতার ওপর।

২৩ সেপ্টেম্বর এ আক্রমণে প্রীতিলতার পরনে ছিল মালকোঁচা দেওয়া ধুতি আর পাঞ্জাবি, চুল ঢাকা দেবার জন্য মাথায় সাদা পাগড়ি, পায়ে রবার সোলের জুতা। ইউরোপীয় ক্লাবের পাশেই ছিল পাঞ্জাবিদের কোয়ার্টার। এর পাশ দিয়ে যেতে হবে বলেই প্রীতিলতাকে পাঞ্জাবি ছেলেদের মতো পোশাক পরানো হয়েছিল। আক্রমণে অংশ নেওয়া কালী কিংকর দে, বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস, শান্তি চক্রবর্তীর পোশাক ছিল ধুতি আর শার্ট। লুঙ্গি আর শার্ট পরনে ছিল মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে আর পান্না সেনের।

বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা যোগেশ মজুমদার (বিপ্লবীদের দেয়া তার গোপন নাম ছিল জয়দ্রথ) ক্লাবের ভেতর থেকে রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ এর দিকে আক্রমণের নিশানা দেখানোর পরেই ক্লাব আক্রমণ শুরু হয়। সেদিন ছিল শনিবার, আনুমানিক প্রায় ৪০ জন মানুষ তখন ক্লাবঘরে অবস্থান করছিল।

তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অস্ত্র হাতে বিপ্লবীরা ক্লাব আক্রমণ শুরু করেন। পূর্বদিকের গেট দিয়ে ওয়েবলি রিভলভার এবং বোমা নিয়ে আক্রমণের দায়িত্বে ছিলেন প্রীতিলতা, শান্তি চক্রবর্তী আর কালীকিংকর দে। ওয়েবলি রিভলভার নিয়ে সুশীল দে আর মহেন্দ্র চৌধুরী ক্লাবের দক্ষিণের দরজা দিয়ে এবং ৯ ঘড়া পিস্তল নিয়ে বীরেশ্বর রায়, রাইফেল আর হাতবোমা নিয়ে পান্না সেন আর প্রফুল্ল দাস ক্লাবের উত্তরের জানালা দিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিলেন।

প্রীতিলতা হুইসেল বাজিয়ে আক্রমণ শুরুর নির্দেশ দেয়ার পরেই ঘন ঘন গুলি আর বোমার আঘাতে পুরো ক্লাব কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ক্লাবঘরের সব বাতি নিভে যাবার কারণে সবাই অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে লাগল। ক্লাবে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলবার ছিল। তারাও পাল্টা আক্রমণ করলো।

একজন মিলিটারি অফিসারের রিভলভারের গুলিতে প্রীতিলতার বাঁ-পাশে গুলির আঘাত লাগে। প্রীতিলতার নির্দেশে আক্রমণ শেষ হলে বিপ্লবী দলটার সাথে তিনি কিছুদূর এগিয়ে আসেন। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিনের এই আক্রমণে মিসেস সুলিভান নামে একজন নিহত হয় এবং চার জন পুরুষ এবং সাত জন নারী আহত হয়।

আহত অবস্থায় প্রীতিলতার ধরা পড়ার আশংকা দেখা দেয়। তাই পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ শেষে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দেন। কালীকিংকর দে'র কাছে তিনি তার রিভলভারটা দিয়ে আরো পটাশিয়াম সায়ানাইড চাইলে, কালীকিংকর তা প্রীতিলতার মুখের মধ্যে ঢেলে দেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড

খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া প্রীতিলতাকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই স্থান ত্যাগ করে। পরদিন পুলিশ ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে মরদেহ দেখে পরবর্তীতে প্রীতিলতাকে সনাক্ত করে। তার মরদেহ তল্লাশির পর বিপ্লবী লিফলেট, অপারেশনের পরিকল্পনা, রিভলভারের গুলি, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি এবং একটা হুইসেল পাওয়া যায়। ময়না তদন্তের পর জানা যায় গুলির আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না বরং পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়াই ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

বেঙ্গল চিফ সেক্রেটারি প্রীতিলতার মৃত্যুর পর লন্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো একটা রিপোর্ট লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ''Pritilata had been closely associated with– if not actually the mistress of– the terrorist Biswas who was hanged for the murder of Inspector Tarini Mukherjee– and some reports indicate that she was the wife of Nirmal Sen who was killed while attempting to evade arrest of Dhalghat– where Captain Cameron fell.''

প্রীতিলতার মৃত্যুর পর তার পরিবারের অবস্থা নিয়ে কল্পনা দত্ত লিখেছেন, তপ্রীতির বাবা শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব করে বলতেন, তআমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছেদ। তাঁদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, তবু তিনি সে দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি। ধাত্রীর কাজ নিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়েছেন, আজো তাঁদের সেভাবে চলছে। প্রীতির বাবা প্রীতির দুঃখ ভুলতে পারেননি। আমাকে দেখলেই তাঁর প্রীতির কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেনদ।

১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর হয়তো শারীরিকভাবে চলে গিয়েছিলেন অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কিন্তু আজো তিনি রয়ে গেছেন কোটি প্রাণের হৃদয়ের গহ্বরে। আজো যখন বাঙালি নারীর অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেয়া হয়, দেশপ্রেম, আদর্শ আর বিপ্লবের কথা লেখা হয় সবার আগে আসে প্রীতিলতার নাম। প্রীতিলতা এক ধূমকেতুর নাম। মাত্র ২১ বছরের প্রীতিলতার দেশপ্রেম, আদর্শ, স্বাধীনতার জন্য অসীম ত্যাগ মানুষ স্মরণ করবে সব সময়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তী বিপ্লবী, অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মবার্ষিকী ছিল গতকাল। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ইতিহাসের অগ্নিকন্যা, জাগরণীয়ার প্রতি।

*(শেষ)*

# অন্য চোখে কাশ্মীর

অনিন্দিতা দে

---

*(পূর্বপ্রকাশিতের পর)*

২

হেমন্তর আকাশ দেখলেই চেনা যায়, যদিও কাশ ফুল নেই, নেই মরা নদীর গাঙ আর দুর্গাপুজোর ঢাক, তবু আকাশে বাতাসে পুজোর গান পুজো পুজো গন্ধ। বাড়ির জন্য মন খারাপ করছিল, কিন্তু ফেরার উপায় নেই। বাড়ির সাথে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন; ইন্টারনেট বন্ধ, বন্ধ কলিং।

মার সাথে কথা বলে ফিরছিলাম গভর্নমেন্টের ইমার্জেন্সির জন্য লাগানো কলিং বুথ থেকে। সে লম্বা লাইন; যাদের বাড়ির লোকেরা বা ছাত্রছাত্রীরা কাশ্মীরের বাইরে বা যারা এখানে আমার মত তাদের সবাই কুশল জানা আর জানানোর জন্য উদ্বিগ্ন। দশ টাকায় কি আর কথা হবে! তারপর আবার ঠেলাঠেলি, গুঞ্জন আর তাড়াতাড়ি বলার তাগাদা, ভাল আছি চিন্তা করো না ব্যাস এইটুকুই বলা হল, জানি মার এতে কিছু হবে না। দাদাকে ফোন করে বলবে। দাদারও কিছু করার নেই। তবু শুনবে আর বলবে, দেখছি কি করা যায়। আমি বাড়ি থেকে এই পালিয়ে যাওয়াটা উপভোগ করছিলাম, হারিয়ে যাবার অনন্দের মত। মন খারাপ আর আনন্দ মিলে মিশে একাকার। এক মন নিয়ে প্রকৃতির কাছে বসার মজাই আলাদা।

হেমন্ত এখানে বসন্তের চেয়েও সুন্দর; পপলার হলুদ, চেনার লাল আর পাইন এর সবুজ যেন ক্যানভাস, পির পাঞ্জালের শৃঙ্খলা সারা দিগন্ত জুড়ে।

আমি যে এলাকায় থাকি সেটা আহমদিয়া কমিউনিটি বহুল। ওদের দর্শনটা বেশ অন্য রকম, তা আমারও ভাল লাগে; 'হিউমানিটি ফার্স্ট'। আবার পাশের গ্রামটা কিন্তু সুন্নি বহুল, ওরা নিজেদের মসজিদে আহমদিয়াদের নামাজ পড়তে দেয় না। আসর বা ঈশার নেমাজ পড়তে হলে আহমদিয়া ছাত্রদের নিজেদের মসজিদেই যেতে হবে। সুন্নি মসজিদে গেলে হবে না। এই নিয়ে কচিকাচাদের মধ্যে প্রচন্ড তর্কাতর্কি শুনে মনটা ওদিকে গেল।

পড়বে নামাজ, সেটার কলমাও এক, কিন্তু এক মসজিদে পড়া যাবে না। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মহিলারা মসজিদ যেতে পারেন কিন্তু সুন্নি বা শিয়া সম্প্রদায়ের মহিলারা পারবেন না। এটাও একটা নিয়ম। আবার এই রকম নানান অসাদৃশ্যের জনই নাকি আহমদিয়ারা ধর্মচ্যুত, খারিজ ইসলাম থেকেও। ওদের ঝগড়ার কারণটা জানতে পারলাম। ধার্মিক মতভেদ যতই থাক, এক জায়গায় কিন্তু এরা কাশ্মিরি; যখন কাশ্মীরিয়াতের

ওপর কোন প্রহার হয়, তখন তারা একজোট। আর এটা বুঝতে পেরেছি স্পষ্ট ভাবে ৪ আগস্ট রাতে। ৩৭০-এ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তারপর সব কিছু খুব স্তব্ধ, সবাই একজোট, সতর্ক। সরকারের সতর্কতা আর স্ট্র্যাটেজিক প্লানিং-এ কোনো অরাজকতা মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু লোকেদের ভয় তাতে কিছু মাত্র কম হয়নি। সাধারণ জনতার এই একটা পীঠ টানটান জীবনে এখানে কে বা করা যেন সব সময়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলে। আর তার খেসারত দিতে হয় কাশ্মিরি সাধারণ জনতাকে।

এত কিছুর পরেও এখানে মেয়েরা যেন খরস্রোতা ঝর্ণা, ঝলমলে। এটা আমাকে খুব অকর্ষণ করে; কেমন করে এরা এত ভাল থাকে? এদের কি আমাদের মত কোন দুশ্চিন্তা নেই, নেই কি কোন মানসিক অবসাদ? চাওয়া পাওয়া? চারিদিকে নারী নির্যাতন, বধূ হত্যা, পণ, মানষিক নির্যাতন; কত কিছুই চলেছে সমাজ জুড়ে। এখানে কি এমন কিছুই হয় না!

এটা বুঝতে গেলে আর একটু ভেতর মহলে ঢুকতে হবে। এখানে নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্ছা বললে ভুল হবে। কারণ তারা আজও পর্দানশীন। অথচ পুরো সমাজটাই মহিলাদের দখলে। তারা অন্দরমহলে থেকেও বাহির জগতের সবটা নিয়ন্ত্রণ করে। অবশই আমি শুধুই সমাজের কথা বলছি। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিকটা নয়, মেয়েদের জন্য সুব্যবস্থা ও সচ্ছলতা যাতে বজায় থাকে তার সুষ্ঠু একটা কাঠামো আমি এখানে দেখেছি। মেয়েদের শিক্ষা এখানে স্পর্শকাতর নয়। ওরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়ে, আর এখানে পুরুষদের জন্য নিষেধাজ্ঞা; তারা দৃষ্টি নামিয়ে চলবে। আর কমবেশি হলেও এটা মেনে চলে পুরুষ। বাতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু যেহেতু এরা কাশ্মীরিয়াতকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর, এরা নিজেদের মহিলা সমাজকে ভীষণ আগলে রাখে। আর সেটা আবরুদ্ধ করে নয়, নিজেদের সংযত করে। নারীর স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়ে। বিয়েতে মেহর প্রথাও এখানে অন্য রকম ঊ আর্থিক সামর্থের জন্যই হোক বা বধূনির্যাতন থেকে বাঁচাতেই হোক; এখানে মহিলারা পৈতৃক সম্পতির ভাগীদার হওয়ার সাথে সাথে স্বামীর সম্পত্বি ও মেহেরের দাবিদার, আর যেহেতু খুলা (মহিলাদের তালাক চাওয়ার প্রথা) নেওয়ার অধিকার আছে, তাই মেহরটা কাগজে কলমে নিকাহনামার সাথে লিপিবদ্ধ করা থাকে। কোনো অসঙ্গতি যেন মেয়েটির আর্থিক স্বচলতা নষ্ট না-করে। নিয়মটা ইসলামিই; কিন্তু জানি না দেশের অন্য কোন প্রান্তে তা সঠিকভাবে পালন হয় কিনা। তবে কাশ্মীরিয়াত ওই নিয়ম অক্ষত রেখেছে। সমাজের কথা বলতে গিয়ে অনায়াসে ধর্ম এসে পড়েছে কারণ কাশ্মীর ইসলাম বহুল প্রদেশ; এখানে ৯৯% মুসলমান। আবার অবাক কাণ্ড হল পদবী কিন্তু আজও কাশ্মিরি পন্ডিতদের অর্থাৎ পূর্বপুরুষ কিন্তু কাশ্মিরি পন্ডিত। শুধু ধর কখন দাড়, ভট্ট অখন ভাট হয়ে গেছে।

আমি সেই ভীষণ সত্যের খুব কাছাকাছি; সেই বিভীষিকা যেটা নাকি কাশ্মীরি মুসলিম আর কাশ্মীরি পন্ডিতদের পায়ে পা মেলানো জীবনচর্যাকে কেবল দু-ভাগে ভাগই করেনি কাশ্মীরিয়াতকেও রক্তাক্ত করেছে। শুধু জানতে ইচ্ছে করছে তারা কারা?

(চলবে)

# বন্ধু আদানীর জন্য জনগণের ছেচল্লিশ হাজার কোটি টাকা বিলিয়ে দিল মোদী সরকার

অমিতাভ সিংহ

---

মোদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণকামী রাষ্ট্রর ধারণা থেকে কয়েক বছরে সরে এসেছে লক্ষনীয়ভাবে। তাই এই জমানায় ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে অসাম্য বেড়েছে ভয়াবহভাবে এবং তা নিয়ে গত এক দেড় বছর ধরে চলছে অবিরাম চর্চা। টমাস পিকোটি, লুকাশ চ্যানসেল, আনমোল সোমাঞ্চি ও নিতিন কুমার ভারতীর গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন মোদীর আমলে ভারতে অসাম্য যেভাবে বেড়েছে তা ব্রিটিশ যুগকেও হার মানায়। গত কয়েকবছর ধরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী লোকসভার বিরোধী নেতা নিয়মিত অভিযোগ করে আসছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী দেশের কতিপয় শিল্পপতি,বিশেষ করে তার দুজন প্রিয় বন্ধু ব্যবসায়ীর জন্য অনৈতিকভাবে দেশের সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছেন। গরীব মানুষের দিকে তার সরকারের চিন্তা নেই, শুধুমাত্র ধনীদের জন্যই তাঁর সব ভাবনাচিন্তা আবর্তিত হচ্ছে। রাফায়েল বিমান বরাতের ক্ষেত্রে দেশীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হ্যালের পরিবর্তে অনিল অম্বানীর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ও কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সংস্থার জন্য সুপারিশ করা।তাও আবার তিনগুণ বেশী মূল্যে। আদানী অম্বানীদের সুবিধার জন্য কৃষক বিরোধী আইন প্রণয়ন। এই আইনের বিরুদ্ধে অন্নদাতা কৃষকদের আন্দোলন ভাঙার জন্য চরমতম পন্থা অবলম্বন।

গত পাঁচ বছরে প্রায় ষোলো ( ১৬ ) লক্ষ কোটি টাকার ঋণ খাতা থেকে মুছে ফেলা বা রাইট অফ করা হয়েছে। এই

তথ্য সংসদে জানিয়েছেন অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ২.৩৪ লক্ষ কোটি,২০২০-২১ বর্ষে ২.০২ লক্ষ কোটি,২০২১-২২ বর্ষে ১৭৪ লক্ষ কোটি,২০২২-২৩ বর্ষে ২.০৮ লক্ষ কোটি ও ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা। বেশীরভাগই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ঋণ মকুব করা হয়েছে। আমি আপনি যদি কয়েক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে থাকি কোন ব্যাঙ্ক থেকে ও সময়মত তা শোধ করতে না পারি ,তাহলে আমার বা আপনার বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হবে ব্যাঙ্ক। এমনকি বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে উত্তক্ত করার বহু নজিরও ঘটেছে। অথচ মোদীর আমলে বিজয় মাল্য,মেহুল চোক্সী,নীরব মোদী বা ললিত মোদীরা জনগনের টাকা মেরে বিদেশে পালিয়ে গেছে সরকারি বাধা ব্যতিরেকে। রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমি কবিতার ভাষায় বলতে হয় এই সরকারের নীতিই হল গরীবের ধন কেড়ে তা ধনীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নীতি।

আদানীদের ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য তাদের কোম্পানির অংশীদার মাধবী পুরী বুচকে দেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির চেয়ারপার্সন বা প্রধান হিসাবে নিয়োগ করার কেলেঙ্কারির ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। একইসঙ্গে মোদীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গৌতম আদানীদের জনগনের অর্থ বাঁকাপথে পাইয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছে ব্যাঙ্কের কর্মী ইউনিয়ন এআইবিইএ। তাদের অভিযোগ ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নিয়ে তা শোধ করতে না পারায় দশটি সংস্থা দেউলিয়া আদালতে চলে গিয়েছিল।তাদের বকেয়া ঋণ ছিল ৬১,৮৩২ কোটি টাকা। এই দশটি সংস্থা কিনেছিল গৌতম আদানীর বিভিন্ন গোষ্ঠী। সরকারের চাপে ব্যঙ্কগুলি বাধ্য হয় এই ঋণ মাত্র ১৫,৯৯৭ কোটি টাকায় রফা করতে। অর্থাৎ বেশীরভাগ ঋণই মকুব করে দেওয়া হল।এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সাধারন মানুষের স্বার্থ। কারণ সাধারন মানুষের আমানত থাকে ব্যাঙ্কগুলিতে।তাদের টাকাই বকলমে পাইয়ে দেওয়া হল আদানীদের।

যে দশটি সংস্থার কথা বলা হচ্ছে সেগুলি হল এইচডিআইএল যা কিনেছে আদানী প্রপার্টিস। তাদের বকেয়া ৭৭৯৫ কোটি টাকার ঋণ মাত্র ২৮৫ কোটি টাকায় রফা হয়েছে। অর্থাৎ ৯৬ % ঋণ মকুব করা হয়েছে। টাকার অংকে যা ৭৫১০ কোটি টাকা। রেডিয়া এস্টেট অ্যান্ড ডেভলাপার্স কিনেছে আদানী গুডহোমস। এখানে ১৭০৯ কোটির ঋণ রফা হয়েছে ৭৬ কোটি টাকায়।মকুব হয়েছে ৯৬% ঋণ। আদানী প্রপার্টিজ কিনেছে ন্যাশান্যাল রেয়ন ও আদিত্য এস্টেট। আদানী পাওয়ার কিনেছে এসার পাওয়ার এমপি লিমিটেড, ল্যাংকো অমরকন্টক পাওয়ার,কোস্টাল এনারজেন লিঃ ও কোরবা ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানি। আদানী পোর্ট অ্যান্ড এসইজেড লিঃ কিনেছে দিঘি পোর্ট ও করাইক্যাল পোর্ট। সব মিলিয়ে মোট ৪৫,৮৫৫ কোটি টাকার বকেয়া ঋণ মকুব করেছে ঋণদাতা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। নিশ্চয়ই তারা নিজ ইচ্ছায় এটা করে নি।করতে বাধ্য হয়েছে সরকারের চাপে।আরও পরিষ্কার করে বললে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে যার আবার ক্ষমতাই নেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া এত বড় দুর্নীতি করতে। দেউলিয়া আইনকে ব্যবহার করে যেভাবে আদানিদের ব্যাবসায়িক লাভ করার রাস্তা দেখানো হয়েছে তা দেখে মনে হয় শয়তানি বুদ্ধি কাকে বলে এদের দেখে শিখতে হয়।এর ফলে লোকসান করতে বাধ্য করা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় হেয়ারকাট যা অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

যদি আপনি ব্যাঙ্কে নূণ্যতম টাকা না রাখেন তাহলে ব্যাঙ্ক আপনাকে জরিমানা করতে ছাড়ে না। গত পাঁচ বছরে এভাবে গরীব ও সাধারন মানুষদের কাছ থেকে ৮৫০০ কোটি টাকা আদায় করেছে ব্যাঙ্কগুলি।

# ব্যক্তিগত কর কর্পোরেট করের থেকে আবার বেশি ঃ নিষ্পেষিত গরিব মধ্যবিত্ত

শুভাশিস মজুমদার

---

পর পর দুই বছর ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ কর্পোরেট কর সংগ্রহকে ছাড়িয়ে গেল। চলমান আর্থিক বছরের (২০২৪-২৫) ১ এপ্রিল থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান নেট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, আয়কর বিভাগ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ কর্পোরেট কর সংগ্রহের চেয়ে বেশি অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে সিকিউরিটিজ ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) সংগ্রহ ২০২৫ অর্থ বর্ষে দ্বিগুণেরও বেশি, ১৬,৬৩৪ কোটি টাকা হয়েছে ।

প্রত্যক্ষ কর মূলত ব্যক্তিগত আয়কর এবং কর্পোরেট ট্যাক্স নিয়ে গঠিত। এস টি টি সংগ্রহ, যা সামগ্রিক ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহের মধ্যে গণনা করা হয়, স্টক মার্কেট ট্রেডিং কার্যকলাপের তীব্র বৃদ্ধির কারণে বেড়েছে। ২০২৪ অর্থ বর্ষে ১ এপ্রিল ১১ জুলাই এর মধ্যে, এস টি টি সংগ্রহ ছিল ৭,২৮৫ কোটি টাকা।

ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ গত দুই আর্থিক বছরে কর্পোরেট কর সংগ্রহের চেয়ে বেশি বেড়েছে। তথ্য দেখায়,

এই অর্থবছরে এ পর্যন্ত সংগৃহীত মোট প্রত্যক্ষ করের ৬০ শতাংশ ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ ছিল।

রিফান্ডের জন্য সামঞ্জস্য করা, এই আর্থিক বছরে ১১ জুলাই পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ বছরে ২১.৪১ শতাংশ বেড়ে ৩.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। এস টি টি সহ, ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহের বৃদ্ধির হার হয়েছে ২৪.০৭ শতাংশ। অন্যদিকে, নেট কর্পোরেট কর সংগ্রহ ১২.৪৭ শতাংশ বেড়ে ২.১০ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

সর্ব মোট (গ্রস) প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ, রিফান্ডের আগে, চলতি আর্থিক বছরের ১১ জুলাই পর্যন্ত ২৩.২ শতাংশ বেড়ে ৬.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ কর্পোরেট ট্যাক্স সংগ্রহকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সাথে, কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে কর্পোরেট ট্যাক্স ছাড় 'বিলিওনিয়ারদের পকেটে' ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি জমা করেছে, যখন মধ্যবিত্তরা ভারী করের ভার বহন করে চলেছে।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি) দ্বারা তথ্য প্রকাশিত হওয়ার একদিন পরেই সরকারের উপর বিরোধী দল আক্রমণ সানায়। তথ্য দেখায় যে ৫,৭৪,৩৫৭ কোটি টাকার নেট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ (১১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত) - এর মধ্যে কর্পোরেশন আয়কর ২,১০,২৭৪ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত আয়কর ৩,৪৬,০৩৬ কোটি টাকা, ফেরত (রিফান্ড) বাদ দিয়ে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, ইনচার্জ কমিউনিকেশনস, জয়রাম রমেশ বলেছেন, (বাজেটের আগে) তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে ১ এপ্রিল থেকে ১ জুলাই ২০২৪ এর মধ্যে মোট (গ্রস) ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩.৬১ লক্ষ কোটি টাকা। মোট (গ্রস) কর্পোরেট কর সংগ্রহ ছিল ২.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা।' 'এই তথ্য, বেশ কিছু সময় ধরে আমরা যে কথা বলে আসছি তা পুনঃনিশ্চিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে -- যে ব্যক্তিরা কোম্পানির চেয়ে বেশি কর প্রদান করছে,' রমেশ এক্স-এর একটি পোস্টে বলেছেন। তিনি বলেন,'ড. মনমোহন সিং যখন অফিস ছেড়েছিলেন, তখন ব্যক্তিগত আয়কর ছিল মোট কর সংগ্রহের ২১%, যেখানে কর্পোরেট কর ছিল ৩৫%। আজ, মোট কর সংগ্রহের মধ্যে কর্পোরেট করের অংশটি এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে, মাত্র ২৬% এ।'তিনি আরো বলেন,'ইতিমধ্যে, মোট কর সংগ্রহে ব্যক্তিগত আয়করের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ শতাংশ হয়েছে।'

রমেশ উল্লেখ করেছেন যে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এ কর্পোরেট করের হার কমানো হয়েছিল এই আশায় যে এটি বেসরকারী বিনিয়োগের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটাবে।' কিন্তু তা ঘটেনি। পরিবর্তে, ডঃ মনমোহন সিং-এর অধীনে জিডিপির ৩৫% - এর শীর্ষ থেকে, ২০১৪-২৪-এ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ২৯%-এর নিচে নেমে এসেছে,' তিনি বলেছিলেন।

'কর্পোরেট ট্যাক্স কাট (কর ছাড়) বিলিয়নেয়ারদের পকেটে ২ লাখ কোটি টাকারও বেশি জমা করেছে, যখন মধ্যবিত্তরা ভারী করের ভার বহন করছে,' রমেশ অভিযোগ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে মধ্যবিত্তরা সরাসরি প্রভাবিত। ক্রমবর্ধমান আর্থিক অসাম্য, বেরোজগারি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং সঞ্চয় হ্রাস।

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী মাত্র এক শতাংশ নাগরিকের হাতে দেশের ৪০ শতাংশ-র বেশি সম্পদ। পাশাপাশি বেরোজগারি হার ৪০ বছরে সর্বোচ্চ। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার কমার কোন লক্ষণ নেই, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের। সাধারণ মানুষের উপভোক্তা হিসেবে খরচের ৪০ শতাংশ ব্যয় হয় বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে। গত বছরের তুলনায় এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৮.৭%, ৮.৬৯% এবং ৯.৩৬%।

২০২৪-এর আরবিআই বার্ষিক রিপোর্ট দেখায়, ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষ-এ গৃহস্থালীর সঞ্চয় মোট জাতীয় ব্যয় যোগ্য আয়ের ৫.২%, যা রেকর্ড সর্বনিম্ন। এবং দেনার (লোন) হার ৫.৭%-এ সর্বকালের সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। ২০১৩-১৪ তে দেনার হার ৩% ছিল। অর্থাৎ দেশের সাধারণ মানুষের ভবিষ্যত ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। জি এন ডি আই চূড়ান্ত খরচ এবং মোট সঞ্চয়ের জন্য জাতির জন্য উপলব্ধ আয় বোঝায়।

## বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের চক্রান্ত ঃ আত্মবিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

মনিরুল হক

---

পট পরিবর্তনের পরে বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েছেন মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা পরিষদ। দায়িত্ব গ্রহনের পর এক মাস কেটে গেল, দেশে এখনও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল না। ছাত্র আন্দোলনের নামে দেশের প্রায় সব থানা আক্রান্ত হয়েছিল, হত্যা করা হয়েছিল বহু সংখ্যক পুলিশকর্মীকে। বিকল করে দেওয়া হয়েছিল পুলিশি ব্যবস্থা। থানাগুলিকে এখনও যথাযতভাবে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয় নি, কবে

হবে কেউ জানে না। ফলে দেশে চলছে বাধাহীন যথেচ্ছাচার। অগ্নি সংযোগ, খুন, রাহাযানি, লুটপাট চলছে জোর কদমে। উপদেষ্টা পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে চলছে মাজার ভাঙার কাজ। সফল করা হচ্ছে বিখ্যাত সব পীরদের শত শত বছরের পুরোনো মাজার ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পরিকল্পিত কর্মসূচি। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। তবে দুটো বিষয়ে সরকার অতীব সক্রিয়- একটি হল অন্তহীন ভারত-বিদ্বেষের প্রচার এবং অপরটি হল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার অদম্য অভিযান। বস্তুত এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তাদের ক্ষমতার বলয়। আর এই উদ্দ্যেশ্যেই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে।

আওয়ামী লিগ সরকারের অন্যায়, দুর্নীতি এবং ত্রুটি ছিল অনেক। কিন্তু সেই সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ও দক্ষিণপন্থী শক্তিকে সব সময় প্রতিরোধ করেছে। কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় নি। এইসব শক্তির অনেক প্রতিভূকে তারা বিচার করে শাস্তি দিয়েছে, অনেককে জেলে আটক করেও রেখেছিল। কোটা বিরোধী আন্দোলনের মাঝেই আন্দোলনকারীরা অন্তত তিনটি জেল ভেঙে বহু দুষ্কৃতিকে মুক্ত করেছে এবং ওই জেল ঘুঘুদের সহিংস আন্দোলনে সামিল করেছে। সরকারে এসে তারা হয়েছে আরও লাগামছাড়া। বহু দাগী আসামীকে তারা জেল থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। সুইডেন আলম,লুৎফার রহমান, কলাবাগান ইমন, আব্বাস, টিটন, পিচ্চি হেলাল,ফ্রীডম বাবু, ফিঙে-র মত অসংখ্য খুনি-গুন্ডা এখন জেলের বাইরে। এরকমই একজন হলেন আবদুল্লাহিল আমান আজামী।

প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার আমান আজামী ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট। তাঁর বাবা ছিলেন পাকিস্তান পন্থী, জামাত ই ইসলামীর আমির গোলাম আজম। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী, স্বদেশের মানুষ হত্যাকারী রাজাকার বাহিনীর স্রষ্টা।মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর তিনি পাকিস্তানে পালিয়ে যান। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর তিনি পাকিস্তানি পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে ফেরেন।২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জামাত ই ইসলামী -বি.এন.পি (খালেদা--নিজামী) জোট সরকারের আমলে গোলাম আজম প্রচুর ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। ওই সময় বিরোধীদের ওপর গ্রেনেড আক্রমণ ,।সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বাধাহীন ভাবে চলেছিল।২০০৯ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার জয়ের পর, ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ওই ট্রাইব্যুনাল গোলাম আজম ও তাঁর পুত্রকে যুদ্ধাপরাধী বলে রায় দেয়। গোলাম আজমের অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি হার্ট এটাকে মারা যান। তাঁর পুত্রের কারাদণ্ড হয়।

এইবার উপদেষ্টামন্ডলীর সরকার গঠিত হওয়ার পর আমন আজমী আবির্ভূত হয়েছেন এবং প্রকাশ্যে এসেই দেশবিরোধী ও জনবিরোধী আওয়াজ তুলছেন। তাঁর দাবি - বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করতে হবে কারণ তা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের পরিপন্থী। এটা ভারত জোর করে বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান বদলের দাবিও তিনি তুলেছেন। বর্তমান সংবিধানে বলা আছে জনগণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি বলেছেন; এটা হতে পারে না, আল্লাহই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সংবিধানে এমন কোনও আইন থাকতে পারে না যা আল্লাহর আইনের বিরোধী। দেশের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাই সংবিধানে মুসলিম চেতনার প্রতিফলন থাকতে হবে।

আসলে এসব দাবি শুধুমাত্র আমান আজামীর দাবি নয়। বাংলাদেশের সমস্ত ইসলাম পন্থী রাজনৈতিক দল, সমস্ত ইসলামিক গোষ্ঠীর দাবিও এইরকম। এ মাসের প্রথমে 'হেফাজতে ইসলাম' মহম্মদ ইউনুসের কাছে যে দাবিপত্র পেশ করেছে তাতে অন্যতম দাবি হচ্ছে - 'মহান আল্লার উপর পূর্ণ আস্থাক্ষ্ম পুনসংস্থাপনপূর্বক একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান তৈরি করা।'

'হিজবুত তাহরীর' লক্ষ্যই হচ্ছে বাংলাদেশ খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করা। তাদের দাবি তারাই ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক। ৫ আগস্টের পর তারা ঢাকা শহরে বিশাল মিছিলও করে। এই সেদিন সিলেটের পরান শাহ পীরের দরগায় হামলাকারীদের হাতে তাদের পতাকাও দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে তারাও উগ্র ইসলামপন্থী। তাদের ঘোষিত লক্ষ্য 'খিলাফত'।আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামিক রাজনৈতিক দল জামায়েত ইসলামের উদ্দেশ্যই হল শরিয়ত আইনের বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং মুক্তিযুদ্ধ এ দুটোকে কোনভাবেই আলাদা করা যায় না। বর্তমান সরকার ভীষনভাবে ঘোষিত এবং অঘোষিত নানা কিসিমের ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে আছে। এঁরা সবেতেই ইসলামের অনুসঙ্গ চান। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হল নির্ভেজাল দেশপ্রেম, দেশেল প্রতি গভীর ভালোবাসা, দেশবন্দনা। এখানে কোনও ইসলামী অনুসঙ্গ নেই। ওঁরা মানবেন কেন? জাতীয় সঙ্গীতে ওঁরা ইসলামী অনুসঙ্গ ঢুকিয়েই ছাড়বেন!

আবার ছাত্রনেতাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তিই হল আত্মবিকৃতি। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ও চেতনাবোধকে প্রাণপণে

বিকৃত করা ও মুছে ফেলাই ছিল তাদের আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। তথাকথিত বিপ্লবের সময় তাঁরা বঙ্গবন্ধু সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মুর্তি, হুল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনের স্মারক, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সহ মোট ১২০০ -র মতো ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দিয়েছে পৈশাচিক উল্লাসে। এ বিষয়ে বর্তমান সরকারের অন্যতম স্তম্ভ হেফাজতে ইসলাম দলের প্রধান মাওলানা মামুনুল হক সাহেবই হয়তো তাঁদের প্রেরণার উৎস। মামুনুল সাহেব 'আওয়ার ইসলাম' পত্রিকাতে লিখেছেন ক্ষ্মকুরআন মজিদ ও হাদিস শরীফে প্রতিমা ও ভাস্কর্য দুটোকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদে স্পষ্ট নির্দেশ 'তোমরা পরিহার কর অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ মুর্তিসমূহ এবং পরিহার কর মিথ্যাকথন। (সুরা হজ্জ৩০)ক্ষ্মাই হোক, ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীবৃন্দ ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা যে সচেতনভাবেই ভুলে থাকতে চান এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।৩২ নম্বর ধানমন্ডির বিশ্ববিখ্যাত বাড়ি বঙ্গবন্ধুর বাসভবন, সেখানকার স্মারক মিউজিয়ামও তাঁরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন। অন্যান্য স্মারকের সঙ্গে সেখানে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকালীন সময়ের তথ্য, ছবি, রেপ্লিকা এবং আরও অনেক কিছু। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ প্রায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যে ঘৃন্য ইতিহাস এই ছাত্র-যুবদের পূর্বসূরীরা তৈরি করেছিলেন তা এখন তাঁরা লুকোতে চান মানুষের মন থেকে। তাই বাড়ি পুড়িয়েই তারা ক্ষ্যান্ত হয় নি, এবছর ১৫ আগস্ট তাঁরা ও তাঁদের বর্তমান প্রভুরা কোন মুজিব-প্রেমীকেই সেই বাড়ির ধারে কাছে ঘেঁসতে দিতে চান নি। তবুও যাঁরা ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ঐ দিন ওখানে গিয়েছিলেন তাঁদের শারিরীক ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, তাঁদের উপর নামিয়ে আনা হয়েছে সশস্ত্র আক্রমণ। আক্রান্তদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এইরকম অপকর্ম যাঁরা করতে পারেন সেই তথাকথিত ছাত্র সমন্বয়করা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে খুব আগ্রহী হবেন সে কথা ভাবার কোন কারণ নেই। বাকি থাকলেন সারাজীবন গুব্ঞ্জ করা কয়েকজন উপদেষ্টা আর এই ক্ষমতাচক্রের মাথা মহম্মদ ইউনুস। এঁরা রাখবেন জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা!

এমনিতেই দেশে এখন ভয়ের পরিবেশ। ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংস্থা উদীচী। ১৯৬৮ সাল। (তখন) পূর্ব পাকিস্তানে এক টালমাটাল সময়। গড়ে উঠল বামপন্থী চেতনার সাংস্কৃতিক সংস্থা উদীচী। আজ সারা দেশে তাদের ৩৫০ টি শাখা। তাঁদের মুক্ত ও প্রগতিশীল চেতনার উপর বারবার আঘাত হেনেছে ইসলামিক মৌলবাদীরা। সবচেয়ে বড় আঘাতটি হেনেছিল জামাত-উল-মুজাহিদিন। ১৯৯৯ সালে তাঁদের যশোর সম্মেলনে এই মুজাহিদিনদের বোমা হামলায় অন্তত ১০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু এইসব করে উদীচীর আদর্শকে শেষ করা যায় নি। তাঁদের কাছে ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে লড়াই দেশপ্রেমের পূর্বশর্ত। এবারেও তাঁরা লড়াইয়ের ময়দানে। এক প্রেস নোটে তাঁরা ঘোষনা করলেন- 'একটি ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বিরোধীতা করা থেকে শুরু করে জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকার উপর আঘাত হানতে শুরু করেছে। ধর্মান্ধদের এই 'হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে' উদীচী ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় সারা বাংলাদেশে একযোগে দেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা .....'গেয়ে ওঠার ডাক দিল। সাড়া পড়ল অভূতপূর্ব। দেশব্যাপী উদীচীর সদস্য সমর্থক, মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী-সাহিত্যিক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ একযোগে গেয়ে উঠলেন

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি....'

আপাতত চুপ করে গেছেন ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। শনিবার অন্তবর্তী সরকারের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা খালিদ হুসেন বলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের কোনও পরিকল্পনা বাংলাদেশের সরকারের নেই। বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে এরকম কোনও সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করতে যাবেন না।

কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি হাল ছেড়ে দেয় নি। এর আগে যতবার আওয়ামী লীগের বিরোধীরা ক্ষমতায় এসেছেন ততবারই তাঁরা জাতীয় সঙ্গীত পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জিয়াউর রহমান, হুসেন মহম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া, এঁরা প্রত্যেকেই 'আমার সোনার বাংলা..' কে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সফল হন নি। বাংলাদেশের মানুষ এক নদী রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ গঠন করেছেন। নিজেদের তাগিদেই তাঁরা সব বাধা, সব বিভেদ তুচ্ছ করে বারবার 'সোনার বাংলা'কে রক্ষা করেছেন, এবারও করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। সেলাম বাংলাদেশ।

# আমরা কি 'খিলাফা-ই-বাংগাল'-এর জন্য প্রস্তুত?

মাকসুদুল হক

---

গত সপ্তাহে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দুটি অশুভ লক্ষণ দৃশ্যমান হয়। ১) ২০১৩ সালে নাস্তিক ব্লগারদের হত্যার জন্য দায়ী জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধানের কারাগার থেকে মুক্তি এবং ০২. সন্ত্রাস ও সহিংসতার জন্য বহু আগেই নিষিদ্ধ ঘোষিত বহুজাতিক জিহাদি সংগঠন হিযবুত তাহরীর, যারা ০৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান-চেষ্টার জন্যও স্বেচ্ছায় দায় স্বীকার করে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের পুনঃপ্রবেশ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, হিযবুত তাহরীর ০৯ আগস্ট বাংলাদেশকে একটি 'খিলাফা' রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। উপসংহারে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ক্ষমতা গ্রহণের তৃতীয় সপ্তাহেও বাংলাদেশের এই 'না সাংবিধানিক না বৈধ' অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানাবিধ বিশৃঙ্খলা নিরসনে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। অব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্তহীনতা এবং অদক্ষতার সঙ্গে জাতিকে ঘিরে থাকা অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার যেন কোনও শেষ নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শূন্যতার এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা আর ঘটেনি, এমনকি ১৯৭১ সালের পরও নয়।

মৌলবাদীদের তোষণ ঃ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই রক্ষণশীল চরম ডানপন্থি মৌলবাদী দলগুলোর প্রতি ড. ইউনূসের ব্যাখ্যাতীত প্রীতির সঙ্গে এবার উপরের বিষয়গুলো যোগ করুন। এর ফলস্বরূপ দেখতে পাবেন, ০৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাত করার কৃতিত্ব জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের 'বিপ্লবী' এবং 'জনগণের ত্রাণকর্তা' বর্ণনা করে তাদের সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় পাতার পর পাতা লিখা হচ্ছে।

এসব মনগড়া বিশ্লেষণে বিশ্বাস রাখার মতো বিশাল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ফেসবুকে বিরাজমান বৈকি! সত্যিটা হলো দেশের ১৮০ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে মোটামুটি এক মিলিয়ন যদি এই 'আষাঢ়ে বিপ্লবে' যোগ দিয়ে থাকে, তাহলে বাকি ১৭৯ মিলিয়নই কিন্তু তাতে যোগ দেয়নি, যার মানে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ 'ফ্যাসিস্ট' নয় এবং তারা কাপুরুষ বা বোকাও নয়।

তাই জামায়াত-শিবিরের প্রতি সমর্থনের প্রসঙ্গে 'জনগণ' নামক শব্দগুচ্ছটি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা সর্বৈব মিথ্যা এবং বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যার বৃহত্তর লক্ষ্যই হলো ভিড়ের মধ্যে থেকে বীরত্ব দেখানো এবং আমজনতাকে বিভ্রান্ত করা।

নেট দুনিয়ায় শোরগোল ঃ আমাদের গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রচারণামূলক ভিডিওর বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, অনলাইনে চটকদার ও অতিরঞ্জিত লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত এবং ডানপন্থিদের এজেন্ট অনেক উসকানিদাতা ড. ইউনূসের কাছে দাবি করছে। ক) তিনি যেন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং খ) বর্তমান সংবিধানকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে 'বিপ্লবোত্তর' আদর্শের সঙ্গে মানানসই নতুন সংবিধান রচনা করেন।

অনলাইনে মগজধোলাই করা এসব ভিডিও মূলত গুপ্ত সংগঠন হিজবুত তাহরীরের এজেন্ডাকেই জায়েজ করতে এবং নির্বোধদের ঘটিবুঝ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেই ছড়ানো হচ্ছে।

ভোট ব্যাংক এবং নির্বাচনি কূটকৌশল ঃ জামায়াতে ইসলামী ইদানীং 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' সমাজ ও রাজনীতির কথা খুব বলে যাচ্ছে, যদিও এই 'অন্তর্ভুক্তি'র মধ্যে কেবল তাদের নিজেদের ভোট ব্যাংকই আছে, যার মধ্যে 'সমমনা' ইসলামি দলসমূহ, 'কওমি মাদ্রাসা'র হুজুরেরা এবং ধর্মান্ধ মোল্লাগণ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের রাজনীতির ইশতেহারে নারী, তৃতীয় লিঙ্গ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয় এবং আদিবাসী সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ইসলাম পন্থিদের,যেমন-সুফি বা এমনকি বামপন্থি দলগুলোকে 'অন্তর্ভুক্ত' করার মতো কোনও বিধান নেই।

২০২৪-এর 'অবিসংবাদিত বীর' কি তবে হিযবুত তাহরীর? হিযবুত তাহরীরের গোপন কর্মপদ্ধতির কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে এমন সব ঘটনা তাদের পক্ষেই ঘটানো সম্ভব। কয়েক দশক ধরে তারা আমাদের সমাজের বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং অভিজাত শ্রেণির শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সদস্যদেরও খিলাফতের ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

তাই শেখ হাসিনার নিপীড়নমূলক শাসনের অবসান ঘটাতে আন্দোলন বেগবান করতে যেভাবে দেশব্যাপী কেপিআইভুক্ত স্থাপনাসমূহ, পুলিশ স্টেশন ইত্যাদিকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা এবং এসব স্থাপনায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, নিখুঁতভাবে চোরাগোপ্তা হামলা হয়েছে ও দক্ষতার সঙ্গে হুজুগে জনগণকেও তাদের পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে; তা

থেকে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে এটা হিজবুত তাহরীরের মতো দক্ষ, পরিশীলিত, সুসংগঠিত এবং দারুণ মেধাবী শহুরে গেরিলাদের দ্বারাই কেবল সম্ভব ছিল।

এই যুদ্ধে ইসলামী ছাত্রশিবির এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা বড়জোর পদাতিক সৈনিক ছিল, নেপথ্যে সত্যিকার জেনারেল এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ছিল আসলে হিজবুত তাহরীর। এই ছিল সংক্ষেপে 'আষাঢ়ে বিপ্লবের' সারাংশ। কিছু পূর্বাভাস, এরপর যা-কিছু ঘটতে পারে।

ঘটনা ১ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনাপত্তি এবং সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ড. ইউনূস রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সংবিধান ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবেন।

. ঘটনা ২ ঃ অরাজকতা ও সহিংসতা অনিবার্যভাবে বাড়তে থাকবে, যার পরিণতিতে সামরিক আইন ঘোষণা করা হবে। ইসলামি শক্তিগুলোকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আরও বেশি সংগঠিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে।

ঘটনা ৩ ঃ শরিয়া আইন অনুসারে দেশ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচনা করা হবে এবং বিশ্বের বুকে একটি নতুন খিলাফত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হবে। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কঠোর পোশাক এবং নাগরিক আচরণবিধি ঘোষণা করা হবে, যা অমান্য করলে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হবে।

ঘটনা ৪ ঃ ডক্টর ইউনূসকে আমির বা খলিফা ঘোষণা করা হবে, যা তাঁর আন্তর্জাতিক অবস্থানের কারণে মার্কিনি ও ইউরোপীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। গণতন্ত্রকে পুরোপুরি উৎখাত করে কিছু থিওক্রেট ও টেকনোক্রেট এবং পূর্ববর্তী কিছু রাজনৈতিক দলের অবশিষ্টাংশ নিয়ে একটি 'নির্বাচিত' শুরা মজলিশ গঠন করা হবে; ইং-মার্কিন জোট তাতে আপত্তি করবে না।

ঘটনা ৫ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'খিলাফা-ই-বাংগাল ' বা 'খেলাফায়ে বাংলা' করা হবে, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করা হবে, নিশ্চিতভাবেই আরও বেশি ইসলামপন্থি রঙের পতাকা এবং ইসলামি মূল্যবোধের জাতীয় সংগীত বেছে নেওয়া হবে। তবে জাতীয় পশু হিসেবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার মনে হয় টিকে যাবে!

*লেখকঃ সংগীতব্যক্তিত্ব, বাংলা ট্রিবিউনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।*

# সোমনাথ হোরের শিল্প দর্শন ও আজকের দিনে তার প্রসাঙ্গিকতা

সৌর বসু

---

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিগত দু সপ্তাহ ধরে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এ মুখরিত হয়ে উঠেছে। ৯ আগস্ট আরজিকর মেডিকেল কলেজে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন একজন মহিলা চিকিৎসক। শুধু খুন নয় তাকে ধর্ষণও করা হয়েছে। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল এবং গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেকদিনই মিছিলের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে একটি দাবি 'we want justice' শুধু যে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা ঘটছে তা নয় সমগ্র ভারতবর্ষের জুড়ে মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। প্রতি ১৬ মিনিটে আমাদের দেশে একজন নারী ধর্ষিত হচ্ছেন। একদিকে আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলছি অপরদিকে মহিলারা প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এই সামাজিক ক্ষতের স্রষ্টা আমরাই এবং আমরাই একে জিইয়ে রেখেছি।

চতুর্পাশের এই ঘটনা আমাকে শিল্পী সোমনাথ দার (সোমনাথ হোর) একটি ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। সোমনাথ দা ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ মানুষ। তার ছেলেবেলা কেটেছে চট্টগ্রামে। ভালো ছাত্র ছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় জল পানি নিয়ে পাশ করার পর কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা আর্ট কলেজে পড়ার সময় জড়িয়ে পড়েন কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। পিসি যোশীর নেতৃত্বে তখন এক ঝাঁক তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক যুক্ত হয়েছেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরী, তাপস সেনের মত পরবর্তীকালের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা মাঠে নেমে গান গাইছেন, মঞ্চ বাঁধছেন ,নাটক করছেন। স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন এই যুবকদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সোমনাথ দা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মাঠে নেমে কাজ করেছেন। চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছাড়াও,তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। পরবর্তীকালে ছাপার আকারে আমরা পেয়েছি তাঁর তেভাগা ডায়েরি, চা বাগানের জার্নাল। তবে একথাও সত্যি তাঁর শিল্পী সত্তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাঁধা ধরা পথে বিকশিত হবার সুযোগ নেই সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। পার্টি নির্দেশিত পথে তাঁর শিল্পসত্তাকে যান্ত্রিকতা গ্রাস করতে পারে বলে তার মনে হয়েছিল । শিল্পীর আবেগ

এবং অনুভূতি প্রবণতাকে সজীব রাখতে গেলে শিল্পীর নিজেকে উদ্ভাবন করা প্রয়োজন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। যদিও মার্কসবাদী ভাবধারা এবং দর্শনের প্রতি তাঁর আস্থা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটল ছিল।

সোমনাথদাকে চিনতাম ছাত্রাবস্থা থেকে। শীর্ণকায়, লম্বা মানুষটি মাথায় টোকা পড়ে সাইকেলে চেপে আসতেন কলাভবনে। ক্লাসের ফাঁকে , ক্লাসের শেষে তাঁদের আড্ডা বসতো কলাভবনের চাতালের পাশে, চিনা বট গাছ তলায়। সেখানে থাকতেন দিনকর কৌশিক, শর্বরী রায় চৌধুরী সোমনাথ হোর, সুষেন ঘোষ সহ অন্যান্য অধ্যাপকেরা। পরবর্তীকালে মানি দাকে (কে.জিসুব্রাহ্মনীয়াম) এই আড্ডায় যোগ দিতে দেখেছি।

সোমনাথদাকে ছাত্রাবস্থা থেকে চিনলেও, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আসে যখন আমি বোলপুরে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মহকুমা আধিকারিক হয়ে আসি। যদিও সোমনাথদার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক পরিচয় বহুদিনের। আমাদের বিভাগের নানা কাজে আমাকে সোমনাথ দার বাড়িতে যেতে হতো। তখন উনি নানা ধরনের গল্প করতেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি উনার গভীর আস্থার কথা তখনই জানতে পেরেছি। স্ট্যালিনের প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যদিও স্ট্যালিনের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা তিনি করতেন।

১৯৯০ এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করে শেক্সপিয়ারের জন্মস্থান Stratford on Avon এ রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি বসানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা সোমনাথ দা এই কাজটি করেন। আমার কাছে মহাকরণ থেকে নির্দেশ এল প্রস্তাবটসোমনাথদার কাছে পেশ করার। সোমনাথ দা তখন থাকতেন লালবাধ গ্রামে। আমি সোমনাথ দার বাড়ি গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইচ্ছার কথা জানালাম। উনি সব শুনে বললেন আমি তো বিমূর্ত কাজ করি। আমার কাজ ওখানে স্থাপন করা হলে দর্শকরা ভুল বুঝবে।

এছাড়াও আমাকে বলা হয়েছিল উনি যদি জায়গাটি দেখতে ইংল্যান্ডে যেতে চান পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার ব্যবস্থা করবে। উনি শুনে বলেছিলেন, 'আমি তো কাজটা করবো না আর তাছাড়া এই বয়সে আমার বিদেশ যাবার কোন বাসনাও নেই।'

সোমনাথ দা মানুষটি ছিলেন অন্য ধাঁচের। বাহুল্যের প্রতি উনি ছিলেন নিরাসক্ত । সহজ সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাস করতেন । নিজের ছবি বিক্রি করার ব্যাপারে ওঁর তীব্র আপত্তি ছিল। অর্থ রোজগারের কথা ভেবে উনি কোনদিন ছবি আঁকেন নি। অন্তরের আবেগ , সমাজের ক্ষতকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল ওঁর দর্শন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রিন্ট মেকার ও ভাস্কর, এছাড়া জলরঙেও কাজ করেছেন । প্রথম জীবনে চিত্তপ্রসাদের কাছে কাজ শিখেছেন। আর্ট কলেজে জয়নূল আবেদিনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। দিল্লিতে ১০ বছর কাটানোর পর তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কলা ভবনে যোগদান করেন। ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে এবং প্রিন্ট মেকিং বিভাগটি গড়ে তোলেন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যান। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তার করা যে কাজটি( ভিয়েতনামি মা) তিনি সব থেকে বেশি মান্যতা দিয়েছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কলা ভবন স্টুডিও থেকে চুরি হয়ে যায়। ঘটনাটি তাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। পরবর্তী জীবনে কলাভবনে থাকাকালীন তিনি আর কোন ভাস্কর্য তৈরি করেন নি। কলাভবন থেকে অবসরেরর পরে তিনি পুনরায় ভাস্কর্যের কাজে মন দিয়েছিলেন। আজকে আমাদের সমাজে মহিলাদের উপর যে পাশবিক ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে, আরজিকর কলেজেও যে ঘটনা ঘটেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সোমনাথ হোর এর ভিয়েতনামী মা কাজটির কথা মনে পড়ে। সাইগনের পতন এবং ভিয়েতনামের দীর্ঘ যুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯৭৫ সালে তিনি কাজটি শুরু করেন। ১৯৪০ এর দশকে মার্কিন ঔপনিবেশিকতাবাদ এর বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের মরণপণ যুদ্ধের সমর্থনে কলকাতায় যে বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছিল সোমনাথ হোর তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তার কাছে এই লড়াই ছিল একটি আদর্শের লড়াই। তিনি বলেছেন আমি বহু বছর ভিয়েতনাম যুদ্ধকে নিজের মধ্যে লালন পালন করেছি। তিনি লিখেছিলেন, 'সেই কঠিন সংগ্রামের প্রতিদিনের খবর পড়ে আমি সেই হতাশ হয়ে পড়ি। দীর্ঘ ২৯ বছরের সংগ্রাম যখন সম্পূর্ণ বিজয়ে শেষ হয়েছিল তখন আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য করেছিলাম, ভিয়েতনামী মা।

কাজটি করতে তাঁর দু'বছর সময় লেগেছিল । একটি মায়ের মূর্তি, নেপাম বোমার আঘাতে যার বক্ষদেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, মাথা উঁচু করে একটি শিশুকে সে বাহুতে জড়িয়ে রেখেছে , স্বাধীনতার আশায়। এটি একটি অপরাজেয় মায়ের ভাস্কর্য এবং বাহুতে জড়ানো শিশুটি নতুন জীবনের প্রতীক। প্রথম জীবনের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা তাঁকে আজীবন তাড়িত করে গেছে।দুর্ভিক্ষের নিরন্ন মানুষগুলির কঙ্কালসার চেহারা ওঁর মনের ক্যানভাসে সব সময় ঘোরাফেরা করত। সমাজের ক্ষত গুলি ওঁকে ব্যথিত করে তুলত। তাঁর ক্ষত সিরিজের ছবি গুলোর মধ্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।এছাড়া শেষ জীবনে ব্রঞ্জে ঢালাই করা মোমের ভাস্কর্যগুলি তাঁর স্বকীয় শিল্পশৈলীর সাক্ষ্য বহন করছে। আজকের সমাজের ক্ষতগুলো যখন মানুষের মধ্যে ক্রোধের জন্ম দিচ্ছে তখন সোমনাথ হোরের শিল্প দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা গভীরভাবে উপলব্ধি করি।

# সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যপাল ও স্পিকারের ভূমিকা

মজিবুর রহমান

---

ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যপাল ও স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটোই সাংবিধানিক পদ। সংবিধানে এই দুই পদের পদাধিকারীদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যপাল কিংবা স্পিকারের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধান রচনার সময় যা বলা হয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত মোটামুটি একই আছে। অন্যান্য বিষয়ে বহুবার সংবিধান সংশোধন করা হলেও রাজ্যপাল বা স্পিকারের ব্যাপারে তা করার প্রয়োজন পড়েনি। গতানুগতিক ভাবে কাজ করলে রাজ্যপাল বা স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে উত্তাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পরিচিত ছকের বাইরে গিয়ে তাঁরা যখন পদক্ষেপ করেন তখন তা আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। স্বাধীন ভারতে বিগত সাড়ে সাত দশকে রাজ্যপাল ও স্পিকারদের এই ছক ভাঙা অবস্থান নিতে একাধিকবার দেখা গেছে। এর ফলে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা স্বাধীন ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে আরও রঙ্গিন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে।

রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি নিয়োগকর্তা হলেও রাজ্যপাল বাছাই বা মনোনীত করার কাজটি করে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সাধারণ ভাবে রাজ্যপালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই রাজ্যপালের সরে যাওয়া অথবা তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সি ভি আনন্দ বোসের পূর্ব পর্যন্ত ২১ জন স্থায়ী ও ৭ জন অস্থায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাত্র সাতজন- পদ্মজা নাইডু (৩.১১.১৯৫৬-১.৬.১৯৬৭), সৈয়দ নুরুল হাসান (১২.৮.৮৬-২০.৩.৮৯ ও ৭.২.৯০-১২.৭.৯৩),কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি (১৪.৮.৯৩-২৭.৪.৯৮), বীরেন জে শাহ (৪.১২.১৯৯৯-১৪.১২.২০০৪), গোপালকৃষ্ণ গান্ধী (১৪.১২.২০০৪-১৪.১২.২০০৯), এম কে নারায়ণন (২৩.১.১০-৩০.৬.১৯) ও কেশরী নাথ ত্রিপাঠী (১৭.৭.১৪-২৯.৭.১৯)-এক বা একাধিক মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। সৈয়দ নুরুল হাসান রাজ্যপাল থাকা অবস্থায় প্রয়াত হন। তাঁর স্মৃতিতে ১৯৯৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কায় প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজ স্থাপন করা হয়। যাইহোক, রাজ্যপালদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়ার একটা বড় কারণ হল, কেন্দ্রে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল বদল হওয়ার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতির মতোই রাজ্যপালের ন্যূনতম বয়স হতে হয় পঁয়ত্রিশ বছর। তবে পঞ্চাশ বছরের কম বয়সে রাজ্যপাল মনোনীত হওয়ার ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে।অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হতে পারেন এমন কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকা যায় না।একজন ব্যক্তি একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল থাকতে পারেন। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। রাজ্যপাল তাঁর কাজের জন্য আদালতের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ফৌজদারি অভিযোগ আনা যায় না। আদালত একজন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে অথবা তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ করা যায় না। এই মুহূর্তে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল হাজতবাস করছেন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন পদত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই গ্রেফতার হন এবং কিছুদিন কারাবাস ভোগ করার পর জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজভবনের একজন মহিলা কর্মচারীকে শ্লীলতাহানি করার লিখিত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আইনি জটিলতার কারণে পুলিশ কিংবা বা আদালত তেমন কোনো পদক্ষেপ করতে পারছে না। রাজ্যপালের এমন সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকা উচিত কিনা, এই প্রশ্ন এখন উঠছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধান তিন স্তম্ভের- শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ- সাথেই রাজ্যপালের সংযোগ রয়েছে।শাসন বিভাগের প্রধান অংশ মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেন।রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক পদাধিকারীদের নিয়োগও রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে হয়ে থাকে।রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্য (চ্যান্সেলর) হন রাজ্যপাল এবং তিনি রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে উপাচার্যদের (ভিসি) নিয়োগ করেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আচার্য-উপাচার্য বিষয়ে রাজ্যপালের সাথে রাজ্য সরকারের সংঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস একতরফাভাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বরখাস্ত এবং নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেন। সরকার রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে। সরকার বরং চেষ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদ থেকে রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অধিষ্ঠিত করতে। তবে শেষ পর্যন্ত সেটা করা যায়নি কারণ রাজ্যপালের অনুমোদন মেলেনি।

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি বিধানসভা আহ্বান করা, স্থগিত রাখা এবং ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি না দিয়ে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে আইনসভার সিদ্ধান্তকে বানচাল করে দিতে পারেন। এই ধরনের ঘটনার বহু নজির রয়েছে। যেমন, মমতা ব্যানার্জির সরকার রাজ্য আইনসভায় পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে বাংলা করার যে প্রস্তাব পাশ করেছিল তা রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে অনির্দিষ্টকাল ধরে পড়ে থেকে কার্যত বাতিল হয়ে গেছে। আইনসভা বন্ধ থাকা অবস্থায় রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে রাজ্যপাল কোনো জরুরি বিষয়ে অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করতে পারেন। বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর এবং প্রথম বার্ষিক অধিবেশন শুরুর সময় রাজ্যপাল আইনসভায় ভাষণ দেন। তবে এই ভাষণের খসড়া রাজভবন তৈরি করে না। রাজ্যপাল রাজ্য সরকার কর্তৃক রচিত ও লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন মাত্র।

রাজ্যপালকে শপথ বাক্য পাঠ করান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। রাজ্যপাল রাজ্যের দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি, অতিরিক্ত জেলা জজ, দায়রা জজকে নিয়োগপত্র দেন। সংবিধানের ১৬১ নম্বর ধারা অনুসারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তিকে রাজ্যপাল ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যপাল রাজনৈতিক বন্দী নকশালদের মুক্তিদান করেন। তবে রাজ্যপাল এই ধরনের পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের ইচ্ছানুসারেই করে থাকেন। উল্লেখ্য, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার রাজ্যপালের থাকে না, সেটা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি করতে পারেন।

সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারায় রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করার কথা বলা রয়েছে। রাজ্যপাল রাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এই মর্মে প্রতিবেদন পাঠালে সাধারণভাবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। জরুরি অবস্থা চলাকালীন রাজ্যে যেহেতু কোনো সরকার থাকে না সেহেতু নিয়মতান্ত্রিক প্রধান রাজ্যপাল প্রকৃত শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রাজ্যপালের এই বিশেষ বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অনেক অপপ্রয়োগ হতে দেখা গেছে। আসলে কেন্দ্রের শাসকদল রাজ্যের বিরোধী শাসকদলের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। রাজ্যপাল সাধারণত রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে ৩৫৬ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারকে ভেঙে দেওয়ার প্রথম ঘটনা ঘটে কেরালায়। সেই সময়ে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বাধীন দেশের একমাত্র অকংগ্রেসী তথা বামপন্থী রাজ্য সরকার বরখাস্ত করা হয়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। এখনও পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ১৩০ বারের মতো রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করা হয়েছে। তবে ২০০৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কোনো রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি।এর একটা বড় কারণ হল এখন ৩৫৬ ধারা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায়। এই মুহূর্তে তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালদের সাথে রাজ্য সরকারের সংঘাতপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে দেখা যাচ্ছে।

এখন অনেকেই রাজ্যপালকে শ্বেত হস্তী বা সাদা হাতির সাথে তুলনা করেন। রাজভবন চালাতে খরচ অনেক। অথচ রাজ্যপাল রাজ্যের মানুষের কোনো কাজে লাগেন না।কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়ে রাজ্যপালের রাজ্য সরকারকে ডিস্টার্ব করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রীর সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর প্রচেষ্টা সুস্থ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী। রাজ্যপালের অতি সক্রিয়তা কোনো সমস্যার সমাধান করে না।সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল ও প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর কর্মকাণ্ড নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই সমীচীন এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার অনেক বেশি।রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যপালের পদ তুলে দেওয়ার দাবি উঠতেও দেখা গেছে।

স্পিকার (অধ্যক্ষ) হলেন লোকসভা বা বিধানসভার প্রিসাইডিং অফিসার। এটি ক্যাবিনেট পদমর্যাদার পদ। রাজ্যপালের মতো স্পিকারও সাংবিধানিক পদ এবং একজন স্পিকার ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদ তথা চাকরিতে থাকতে পারেন না।লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে স্পিকার নির্বাচন করেন। একটা সাধারণ নির্বাচন থেকে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত সময়কালের জন্য স্পিকার নির্বাচিত হন। দুটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী একাধিক হতে পারেন কিন্তু স্পিকার সাধারণত একজনই থাকেন। যেমন, ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত নবম লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দুজন- ভি পি সিং ও চন্দ্রশেখর কিন্তু স্পিকার ছিলেন একজন- রবি রায়। আবার, ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত একাদশ লোকসভায় তিনজন প্রধানমন্ত্রী হন- অটল বিহারী বাজপেয়ী, এইচ ডি দেবেগৌড়া এবং আই কে গুজরাল কিন্তু স্পিকার থাকেন

একজনই- পি এ সাংমা। সাধারণভাবে শাসকদলের সাংসদ বা বিধায়কই স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠন ও তাদের চেয়ারপারসন মনোনীত করেন।তিনি নিজে ব্যবসা (বিজনেস) উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে সভার কার্যাবলী নির্ধারণ এবং সময় বরাদ্দ করেন। এছাড়াও উদ্দেশ্য (সাবজেক্ট) কমিটি ও বিধি (রুলস) কমিটিরও প্রধান তিনি। একটা বিল অর্থ বিল কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী স্পিকার। কোনো বিলকে অর্থ বিল বলে গণ্য করা না করার তাৎপর্য এই যে, অর্থ বিল সভায় পাশ করাতে ব্যর্থ হলে সরকারের পতন ঘটে। এজন্য অর্থ বিলের আলোচনা ও ভোটাভুটির সময় সরকারকে সতর্ক বা সিরিয়াস থাকতে হয়।সভায় ভোটাভুটির সময় স্পিকার ভোট দিতে পারেন না। তবে ভোটাভুটির ফলাফল সমান সমান অর্থাৎ টাই হলে স্পিকার তাঁর ভোট প্রদান করেন যাকে বলে কাস্টিং ভোট। সাংসদ, বিধায়করা স্পিকারের উদ্দেশ্যে কথা বলেন বা বক্তৃতা করেন। স্পিকারের মাধ্যমে সরকার কিংবা কোনো মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। স্পিকারকে প্রধানমন্ত্রী / মুখ্যমন্ত্রীও স্যাব / ম্যাডাম সম্বোধন করেন। একজন স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পক্ষে সারাক্ষণ সভা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাই কয়েকজন সাংসদ বা বিধায়ককে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করা হয়। সভাকক্ষে স্পিকার/ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে এই প্যানেলের সাংসদ/বিধায়করা সভা পরিচালনা করেন।

স্পিকার শাসকদলের সদস্য হলেও হাউসের মধ্যে তিনি সরকার পক্ষের লোক নন, নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতার ব্যাপারটা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ১৯৬৭ সালে স্পিকার নির্বাচিত হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২০০৪ সালে বামপন্থীদের সমর্থনে ডঃ মনমোহন সিংয়ের সরকার গঠিত হয়। স্পিকার নির্বাচিত হন সিপিআইএম সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২০০৮ সালে সিপিআইএম সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। পার্টি সোমনাথ চ্যাটার্জিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। তিনি দলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, সাংবিধানিক পদ দলীয় নির্দেশের উর্ধ্বে। পার্টি তাঁকে বহিষ্কার করে।

অষ্টাদশ লোকসভা পর্যন্ত ১৭জন ব্যক্তি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন।নীলম সঞ্জীব রেড্ডি (১৭.৩.৬৭-১৯.৭.৬৯ ও ২৬.৩.৭৭-১৩.৩.৭৭),বলরাম জাখর (১৯৮০-'৮৯) ও ওম বিড়লা (২০১৯-) দু'বার করে স্পিকার হয়েছেন। রেড্ডি প্রথমবার পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণে এবং দ্বিতীয় বার পদত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য। মহিলা স্পিকার হয়েছেন দুজন কংগ্রেসের মীরা কুমার (২০০৯-'১৪) ও বিজেপি'র সুমিত্রা মহাজন (২০১৪-'১৯)।

১৯৫২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মাত্র ৯ জন ব্যক্তি স্পিকার হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তৃতীয় সরকার চলছে কিন্তু স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন একজনই- বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে সাতবার কিন্তু স্পিকার হয়েছেন মাত্র দু'জন- মনসুর হাবিবুল্লাহ (১৯৭৭-'৮২) ও হাসিম আব্দুল হালিম (১৯৮২-২০১১)।

দলবদল বা এক দলের টিকিটে ভোটে জিতে অন্য দলে যোগদান একটি অনৈতিক কাজ।এই অনৈতিক কাজ আটকানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে দলত্যাগ বিরোধী আইন।এই আইনের প্রয়োগ ঘটবে স্পিকারের মাধ্যমে। সম্প্রতি সাংসদ ও বিধায়কদের মধ্যে দলবদলের প্রবণতা সাংঘাতিক ভাবে বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লোকসভা বা বিধানসভার স্পিকার এই দলবদলুদের সাংসদ বা বিধায়ক পদ খারিজ করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না।এর মাধ্যমে নীতিহীন রাজনীতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্পিকাররা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকতে পারছেন না। তাঁরা দলীয় নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছেন। শাসকদল বা সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো পদক্ষেপ করার সাহস দেখাতে পারছেন না।

*লেখক , কাবিলপুর হাই স্কুল , মুর্শিদাবাদ এর প্রধান শিক্ষক।*

# সাম্প্রদায়িক গোরক্ষক বাহিনীর বর্বরোচিত কাজ

শুভাশিস মজুমদার

---

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি রবিবার (সেপ্টেম্বর ১, ২০২৪) সংখ্যালঘুদের উপর, বিশেষ করে মুসলমানদের উপর 'নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণের' সময়ে বিজেপি সরকারকে 'নিরব দর্শক' বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং এই ধরনের ঘটনার পিছনে 'নৈরাজ্যবাদী উপাদান (পড়ুন দুর্বৃত্ত)' এর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক হিংসার দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই মন্তব্য।

২৭ শে আগস্ট, হরিয়ানার চরখি দাদরিতে পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলিম অভিবাসীকে গোমাংস খেয়েছে বলে সন্দেহে গোরক্ষকদের দ্বারা পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি রবিবার (সেপ্টেম্বর ১, ২০২৪) সংখ্যালঘুদের উপর, বিশেষ করে মুসলমানদের উপর 'নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণের' সময়ে বিজেপি সরকারকে 'নিরব দর্শক' বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং এই ধরনের ঘটনার পিছনে 'নৈরাজ্যবাদী উপাদান (পড়ুন দুর্বৃত্ত)' এর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক হিংসার দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই মন্তব্য।

২৭ শে আগস্ট, হরিয়ানার চরখি দাদরিতে পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলিম অভিবাসীকে গোমাংস খেয়েছে বলে সন্দেহে গোরক্ষকদের দ্বারা পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। হামলায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

মহারাষ্ট্রে গরুর মাংস বহনের সন্দেহে ট্রেনে এক বৃদ্ধকে মারধর করা হয়েছে। তিনি কল্যাণে যাচ্ছিলেন।

দুটি ঘটনার স্ক্রিনশট শেয়ার করে, যার ভিডিওগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাহুল গান্ধি বলেন যে যারা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ঘৃণাকে ব্যবহার করে ক্ষমতার সিঁড়িতে আরোহণ করেছে তারা ক্রমাগত দেশে 'ভয়ের শাসন' প্রতিষ্ঠা করছে।

'জনতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঘৃণ্য দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে হিংসা ছড়াচ্ছে, আইনের শাসনকে চ্যালেঞ্জ করছে। এই দুষ্কৃতীরা বিজেপি সরকারের কাছ থেকে খোলা ছাড় পেয়েছে, তাই তারা এটি করার সাহস পাচ্ছে', কংগ্রেস নেতা এক্স-এ হিন্দিতে একটি পোস্টে এই কথা বলেছেন।

সংখ্যালঘুদের উপর, বিশেষ করে মুসলমানদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ সত্ত্বেও, সরকারী যন্ত্র 'নিরব দর্শক' রয়ে গেছে। 'এই ধরনের' নৈরাজ্যবাদী 'দুর্বৃত্তদের' বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত', রাহুল হিন্দিতে একটি পোস্টে বলেছেন।

তিনি আরো বলেন, 'ভারতের সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং ভারতীয়দের অধিকারের ওপর যে কোনো আক্রমণ সংবিধানের ওপর আক্রমণ, যা আমরা মোটেও বরদাস্ত করব না।' 'বিজেপি যতই চেষ্টা করুক না কেন, আমরা যে কোনো মূল্যে ভারতকে ঘৃণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়ী হব।'

গো রক্ষার নামে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত ২৭ আগস্ট হরিয়ানার চরখি-দাদরি জেলায় পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মালিককে পিটিয়ে খুন করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গো মাংস খেয়েছেন সাবির, এই সন্দেহে তাঁকে খুন করা হয়। নৃশংস ঘটনায় ৫ গোরক্ষা দলের সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আবার মহারাষ্ট্রে ধুলে এক্সপ্রেসে গোরুর মাংস নিয়ে যাওয়ার সন্দেহে আশরাফ আলি সৈয়দ হুসেন নামের এক ৭২ বছরের বৃদ্ধকে মারধর করা হয়। জানা যায় ওই ব্যক্তি জলগাঁও থেকে ধুলে সিএসএমটি এক্সপ্রেসে যাচ্ছিলেন নিজের মেয়ের সাথে দেখা করতে।

৭২ বছরের হাজী আশরাফ আলী সৈয়দ হুসেনকে ২৪ বছরের দুষ্কৃতী আকাশ ভরা চলতি ট্রেনের মধ্যে মারধোর করে। এতে আশরাফ আলী মারাত্মক জখম হন। দুঃখের বিষয়, উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার সাহস বিশেষ কেউ পাননি। ধরা পড়ার একদিন বাদেই অপরাধী জামিন পেয়ে যায়।

গত ২৪ শে আগস্ট হরিয়ানার ফরিদাবাদের বাসিন্দা ১৯ বছরের আরিয়ান মিশ্র কে মুসলিম গরু পাচারকারী ভেবে 'গোরক্ষক' অনিল কৌশিক গুলি করে খুন করে। পরে আরিয়ানের পরিচয় প্রকাশ পেলে বড় অস্বস্তিতে পড়েছে ফরিদাবাদ পালওয়ালের বজরং দল তথা গো রক্ষকদের সংগঠন। আরিয়ানের বাবা মা সিয়ানন্দ ও উমার প্রশ্ন,'মুসলিম

## পুরস্কার ও সন্মান মূল্য ত্যাগ

---

আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ ও নির্মম হত্যা এবং রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যার্থতা ও ভূমিকার প্রতিবাদে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক অধ্যাপক অভ্র ঘোষ রাজ্য সরকার প্রদত্ত বিদ্যাসাগর পুরস্কার ত্যাগ করেছেন।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক পরিমল দে, উত্তরবঙ্গ নিমতিঝোড়া হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, আর.জি.কর মেডিক্যাল হাসপাতালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আয়োজিত উত্তরবঙ্গ উৎসবের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত ' বঙ্গরত্ন ' পুরস্কার ত্যাগ করেছেন।

বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন আর.জি.কর হাসপাতালে সংগঠিত উপরোক্ত নির্মম হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁকে রাজ্য সরকার প্রদত্ত দীনবন্ধু পুরস্কার ত্যাগ করেছেন।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক আশীষ লাহিড়ী একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর পুরস্কার ত্যাগ করেছেন।